ব্রাহ্মসমাজে

শশিপদ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতা

১৩৩১

প্রকাশকের নিবেদন।

পরম ব্রহ্মের সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছে, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনাতে যাঁহার জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত ; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের ত্রিধারা যাঁহার জীবনে সম্মিলিত ও বাস্তবতায় পরিণত ; সত্যের তপস্যায়, মঙ্গলের অনুষ্ঠানে এবং সুন্দরের রসে যাঁহার মন প্রাণ তৎপর, মগ্ন ও তৃপ্ত . 'প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর, এই ভাবে দিন কাটুক আমার'—যাঁহার জীবনের মন্ত্র, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ মহৎ ও দুর্ব্বল মানবের পক্ষে বাস্তবতায় পরিণত করা দুঃসাধ্য হইলেও এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে যাঁদের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মহৎ ও বিশ্বজনীন আদর্শ বিকশিত ও পরিস্ফুট হইয়া শোভন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে. এমন লোকের অভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসে ও বিশ্বসমাজের ভক্তমণ্ডলীতে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সেবাব্রত ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি গৌরবমণ্ডিত আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীবন হতেই জীবনের উৎপত্তি। মহৎ জীবনের আলোচনায় আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবন মহত্ত্ব লাভ করিবে, এই আশা পোষণ করিয়া আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর জনৈক সহকারী সম্পাদক ব্রহ্মর্ষি শশিপদের জীবনের সাধনাও সিদ্ধি, বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রার্থনার বলে যে অঘটন ঘটে, এবং আনন্দ ব্রহ্মের সহিত যোগে যুক্ত হইলে বাক্য, চিন্তা ও কার্য্য মাধুর্য্যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠে, ত্রিতাপতাপিত সংসারে শান্তির ধারা প্রবাহিত হয়—তাহাই এই

পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। সেবাব্রত শশিপদের জীবনের মধুর সংস্পর্শ যাঁরা লাভ করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে আমি একজন। জীবনে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে এই মহজ্জীবনের আলোচনায় ব্রাহ্মবন্ধুগণের ও ভারতবাসীর অশেষ কল্যাণ হবে। সাধনায় সিদ্ধি। বিশ্বাস হয় যে ব্রহ্মর্ষির সাধন মার্গ জানিয়া আমরা সাধন তৎপর হইব ; তাহা হইলেই আমাদের সিদ্ধি ধ্রুব ও অদূরবর্ত্তী। ইতি—

কলিকাতা। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

সূচীপত্র

১।	ঈশ্বর ভক্তির প্রেরণা ...	১
২।	জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ...	৩
৩।	সমাজ সেবা প্রত্যেক ধার্ম্মিকের অবশ্য কর্ত্তব্য ...	৪
৪।	ব্রহ্মর্ষি শশিপদ আনন্দ ব্রহ্মের উপাসক	৫
৫।	তৈত্তিরিয় উপনিষদের ভৃগুবরুণ সংবাদ	৫
৬।	সমাজ সেবায় ব্যক্তিগত চরিত্রের স্থান	৮
৭।	বরাহনগরে সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন	৮
৮।	তাহা হইতে বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব	৯
৯।	ব্রহ্মর্ষির ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ...	১০
১০।	তজ্জন্য আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক সংসবত্যাগ ও নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন ...	১১
১১।	ধোপা নাপিত মেথর প্রভৃতি বন্ধ ...	১৩
১২।	নিমচাঁদ মৈত্র মহাশয় বাধ্য হইয়া ব্রহ্মর্ষির সঙ্গে এক নৌকায় কলিকাতা যাতায়াত বন্ধ করেন	১৩
১৩।	নৌকা বন্ধ	১৪
১৪।	শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহার ...	১৪
১৫।	পৈতৃক বাড়ীতে নির্য্যাতন ...	১৫
১৬।	পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ ...	১৭
১৭।	শ্বশুর বাড়ীতেও স্থান নাই	১৭

১৮। স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহ—নিজ পত্নীকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন ১৮
১৯। তদ্দৃষ্টে অপরাপর স্ত্রীলোক দিগের শিক্ষালাভের জন্য চেষ্টা ২০
২০। দীননাথ নন্দীর পূজা দালানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২১
২১। চণ্ডাল দিগের সহিত ভ্রাতৃত্ব ২৩
২২। শ্রমজীবিগণের হিত সাধন ২৩
২৩। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ২৪
২৪। নৈশ বিদ্যালয়ের গৃহে অগ্নিদাহ ২৫
২৫। নানাস্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ২৬
২৬। Daily News ও নব বার্ষিকী পত্রিকায় ব্রহ্মর্ষির কার্য্যের উল্লেখ ২৭
২৭। শ্রমজীবি সভা ২৮
২৮। ব্রহ্মর্ষির সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা ২৯
২৯। সূতিকাগার সমূহের সংস্কার চেষ্টা ৩০
৩০। ব্রহ্মর্ষির শিশু প্রীতি ৩১
৩১। রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ে ব্রহ্মর্ষির শিক্ষার ফল ৩২
৩২। বালক বালিকাদিগের উন্নতির জন্য ব্রহ্মর্ষির কার্য্য ও তাহাদিগের উপযোগী সঙ্গীত প্রণয়ন ... ৩৩
৩৩। বরাহনগর municipality সংস্থাপনে ব্রহ্মর্ষির হাত ৩৬
৩৪। দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্য ৩৭
৩৫। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষির উপদেশ ... ৩৮
৩৬। রামতারণ বাবুর প্রতি ব্যবহার ৩৯
৩৭। সাধারণ ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠা ৩৯
৩৮। ব্রাহ্মসমাজের তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা ৪১

৩৯। ব্রহ্মর্ষির জীবনে প্রার্থনার আধিপত্য ... ৪২
৪০। ব্রহ্মর্ষির প্রবর্ত্তিত অষ্টমঙ্গলা ৪৬
৪১। দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের জন্য আত্মীয় সভা ৪৬
৪২। আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা ... ৪৮
৪৩। কেশববাবুর প্রতি তাহার অশেষ শ্রদ্ধার পরিচয় ৫১
৪৪। সমাজ মধ্যে সঙ্কীর্ণভাব দর্শনে ব্রহ্মর্ষির মানসিক ক্লেশ ৫২
৪৫। এক বেদীতে তিনমতের তিন আচার্য্যের সমাবেশ ৫৩
৪৬। বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শিবচন্দ্রদেবের
প্রতি ব্রহ্মর্ষির ব্যবহার ৫৪
৪৭। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের
প্রতি ব্রহ্মর্ষির ব্যবহার ৫৬
৪৮। ব্রহ্মর্ষির শান্তিপ্রিয়তা ও শান্তি সংস্থানে চেষ্টা ... ৫৬
৪৯। ব্রাহ্মসম্মিলন সভা ... ৫৭
৫০। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য সমাজের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা ৫৮
৫১। ব্রহ্মর্ষির বিলাত প্রবাস ৬০
৫২। সাধারণ ধর্ম্মসভা সংস্থাপন ... ৬১
৫৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ ৬২
৫৪। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রহ্মর্ষির টান ৬৩
৫৫। ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান ৬৪
৫৬। ব্রাহ্মসমাজের সেবা ৬৫
৫৭। ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় ৬৬
৫৮। মাঘোৎসব কার্ড ৬৭
৫৯। কৃষ্ণগঞ্জে ধর্ম্মপ্রচার ও ডিষ্ট্রিক্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সভা ৬৮
৬০। সাধকমণ্ডলী ৬৯

৬১। বিধবাদিগের হিতচেষ্টা ৬৯
৬২। ব্রহ্মর্ষির "How to make Brahmaism the National religion of the country" ৭০
৬৩। ব্রহ্মর্ষি ও রামেন্দ্র রায় ৭১
৬৪। ব্রহ্মর্ষি ও ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ... ৭২
৬৫। আজীবন বন্ধুত্ব ৭৬
৬৬। দেবালয় ৭৭
৬৭। বিধবাশ্রমের কথা ৭৯
৬৮। নানা সৎকার্য্যে দান ৮৩
৬৯। দেবালয়ের সাপ্তাহিক সঙ্কীর্ত্তনের কথা ... ৮৮
৭০। ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে ব্রহ্মর্ষির রচিত গান ... ৮৯
৭১। ব্রহ্মসন্নিধির ফল ৯১
৭২। মিতব্যয়িতা ৯২
৭৩। সুরেন্দ্রনাথ ও প্রেমলতার কথা ৯২
৭৪। ভৃত্যের প্রতি ব্রহ্মর্ষির ব্যবহার ১০০
৭৫। পানাহারে সংযত ব্যবহার ১০০
৭৬। ব্রহ্মর্ষি সম্বন্ধে পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র বেদান্তভূষণের কয়েকটি কথা ১০৩
৭৭। কাশীপুরের মহিম চক্রবর্ত্তীর কথা ১০৫
৭৮। বিপদে ধৈর্য্য ও ভগবন্নিষ্ঠা ১০৭
৭৯। বঙ্গভাষার প্রতি ব্রহ্মর্ষির টান ১০৯
৮০। উৎপীড়নকারীদিগের প্রতি ব্যবহার ... ১১১
৮১। একজন ব্রাহ্ম-যুবকের কথা ১১১
৮১। বরাহনগরের হরিচরণ মাইতির কথা ... ১১৩

৮২। "আমায় কাঙালের কাঙাল কর" . ১১৭

৮৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে ব্রহ্মর্ষির প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহের ভার অর্পণের প্রস্তাব . .. ১১৮

৮৪। গোপালচন্দ্র দের কথা .. . ১১৯

৮৫। অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা ১১৯

৮৬। বৈদ্যনাথের কথা ১২১

৮৭। শ্রীধর ঘোষের কথা . ১২৩

৮৮। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা ১২৫

৮৯। রোগীর সেবা ও মৃতের সংকার . .. ১২৭

৯০। কালীকৃষ্ণ দত্তের কথা ১২৯

৯১। ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর উক্তি ১৩০

৯২। শক্তিসঞ্চরণ . .. ১৩২

৯৩। কোমলে কঠিন ১৩৪

৯৪। বিধবা বিবাহে উৎসাহ ১৩৪

৯৫। বিধবা ভাগিনেয়ী কুসুমকুমারীর বিবাহের আশ্চর্য উপাখ্যান ১৩৬

মনের বলের সূচীপত্র

১। ব্রহ্মষির জীবনে চিন্তার বিকাশ ২

২। অভ্যাসত্যাগে মানসিক বলের প্রয়োজন ... ৩

৩। অঙ্গীকার রক্ষা ও কর্ত্তব্যপালনে মানসিক বলের প্রয়োজন ৪

৪। ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক ধূমপান অভ্যাস ত্যাগ ৫

৫। মিস কার্পেণ্টারের গৃহেজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ব্রহ্মর্ষির মানসিক বলের পরিচয় ৭

৬। বরাহনগরে মিস কার্পেণ্টারের আগমন উপলক্ষে নানাবিধ কষ্ট ৮

৭। শশিপদ ইনষ্টিটিউট হল প্রতিষ্ঠা ৯

৮। শ্রমজীবিদিগের প্রতি পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রহ্মষির কার্য্য ১২

৯। বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মর্ষির চরিত্রের নানাগুণের প্রকাশ ১৬

১০। কোমলতা ও দৃঢ়তার সম্মিলন ১৭

১১। তেতালা হইতে কন্যা সুখতারার পতন ... ১৮

১২। আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য ২০

১৩। মিসেস গ্রাণ্টের ব্যবহার ২১

১৪। ব্যাথ্‌গেট কোম্পানীর কার্য্য ত্যাগ ... ২৪

১৫। পোষ্ট আপিসের ২০০ শত টাকা বেতনের কার্য্য ত্যাগ ২৫

১৬। তেজস্বিতা, সাধুতা ও ঈশ্বরে নির্ভরতা ... ২৬

১৭। শান্তিপ্রিয়তা ও ধীরতা ২৮

১৮। মনের বল ৩০

ব্রাহ্মসমাজে

শশিপদ

—*—*—*—

প্রকৃত ঈশ্বরভক্তির একান্ত প্রেরণায় মানব বিবিধ সংস্কারমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ কি তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রশ্ন, ভগবান্ কোথায় ? তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে ? আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এবং য়ুরোপে মধ্যযুগে এক দার্শনিক সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, এই জগৎ, এই মানবমণ্ডলী, মানবের এই বিবিধ কার্য্য ও সম্বন্ধ, এ সকলের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ তো নাই-ই ; অধিকন্তু এ সমস্তই তাঁহার বিরোধী ও বিপরীত। এইরূপ মতবাদ আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার, ইহলোকের সহিত পরলোকের, সংসারের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ এবং বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। এই মত যাঁহারা অনুসরণ করিতেন, তাঁহারা সমাজ, সংসার ও যাবতীয় মানবীয় সম্বন্ধ পরিহার করিয়া অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সেই পরমাত্মার জ্যোতি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজীতে এই মতবাদের নাম Deism.

ইহা ছাড়া আর এক মত আছে তাহার নাম Pantheism. সেই মতবাদীরা বলেন, এই বিশ্বই ব্রহ্ম, এই প্রকৃতিই ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্ম

বিদ্যমান। এই দৃশ্যমান্ বিশ্বের বাহিরে তিনি নাই। আবার এই দুই মতের একটা সমন্বয়ও আছে। তিনি বিশ্বেও আছেন, বিশ্বের বাহিরেও আছেন। বিশ্ব তাঁহাতেই আছে সত্য, কিন্তু তিনি বিশ্বের মধ্যে সমগ্রভাবে নাই। তিনি অসীম লীলায় আনন্দের জন্য সসীমের মধ্যে ধরা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অসীমত্বের ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি সসীমের মধ্যে সসীম হইয়া পড়েন নাই। তিনি এই বিশ্বেও যেমন আছেন, আবার নিজের অসীম মহিমায়ও তেমনি রহিয়াছেন। তাঁহার যেমন স্বরূপ লক্ষণ আছে, তেমনি তটস্থ লক্ষণও আছে। এই দুইটি দিকই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় সসীমের সহিত অসীমের এই বিচিত্র সম্বন্ধ অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥

ইহাই লীলাময়ের লীলা। সসীম সর্ব্বদা অসীমকে প্রকাশ করিবার

জন্য ব্যাকুল। আবার সেই অসীম, তিনি সসীমের মধ্যে ধরা দিবার জন্য তুল্যরূপে ব্যস্ত। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া নাই। রবীন্দ্রনাথ গাইয়াছেন ;—

সীমার মাঝে, অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।

এই ধর্ম্মমত যেদিন মানবচিত্তে অভিব্যক্ত হইল, সেদিন মানবজাতি ধন্য হইল। মানব আপন স্বর্গীয় প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

পূর্ব্বে যে-ধর্ম্মমতের কথা বলা হইল, ইহা বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজগতের সুধীবৃন্দ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আদরের সহিত আলোচিত ও অবলম্বিত হইতেছে। এই মতবাদ আশ্রয় করিলে, মানবের ধর্ম্ম কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা দেখা যাউক। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি পথের মধ্যে বিরোধ প্রাচীন কাল হইতে জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এখন অবশ্য এই তিনটিই তুল্যভাবে এক মানবপ্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া

স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মবিহীন ভক্তি অথবা কর্ম্ম ও ভক্তিবিহীন জ্ঞান কিংবা জ্ঞান ও ভক্তি-হীন কর্ম্ম অসম্ভব। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সৎ চিৎ ও আনন্দ একই অখণ্ড পদার্থ। চৈতন্যের দিক্ হইতে দেখিলে যাহা সৎ চিৎ ও আনন্দ, প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিলে তাহাই সত্ত্ব, রজ ও তম। যেখানে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, তাহা অব্যক্ত, সুতরাং আমাদের বিবেচনার অতীত। এখন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ই ধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দকে অনুভব করিতে হইবে, ধ্যান ধারণা, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহস্থালীতে, আমাদের জাগতিক নিখিল সম্বন্ধ ও ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার বিজয়দণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পর তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে—অন্তরের অন্তরে ব্রহ্মরূপে, অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে পরমাত্মারূপে এবং অনন্তলীলা বা ইতিহাসের মধ্যে তাঁহাকে ভগবান্-রূপে উপভোগ করিতে হইবে। তিনি রসস্বরূপ, তাঁহার রসকণা লাভ করিয়া জগৎ আনন্দে অধীর; তাঁহার সেই রস উপভোগ করিতে হইবে। তিনি প্রেমস্বরূপ, সেই প্রেম আস্বাদন করিতে হইবে; সেই প্রেমে মত্ত ও অধীর হইতে হইবে। এই তিনই একসময়ে চলিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি বিশ্ব হইয়াও বিশ্বের অতীত। সুতরাং বিশ্বজীবনের মধ্যে মিশিয়া বিশ্বনাথের কার্য্যও করিতে হইবে। আবার এই সমস্তের মধ্যে তাঁহার দিকে উন্মুক্ত থাকিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সাধনা।

তাহা হইলে, সমাজের সেবা করিতে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বাধ্য। তিনি যেখানে দেখিবেন গ্লানি ও দুর্নীতি, যেখানে দেখিবেন মানবের ভ্রম ও কুসংস্কার সেই বিশ্বনাথের পূর্ণ জ্যোতিকে আবরণ করিয়াছে, তাঁহার

উন্নত কর সেই বিশ্বনাথের আহ্বানে সেইখানেই পতিত হইবে। এই যে মানবের সেবা, ইহা প্রশংসালাভের জন্য নহে; প্রাণের ব্যাকুলতায়, হৃদয়ের একান্ত আগ্রহে। দুঃখীর দুঃখের মধ্যে, পীড়িতের আর্তনাদের মধ্যে, এমন কি পাপীর পাপের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলহস্ত রহিয়াছে। সেই প্রেমময় সেইস্থান হইতেই ব্যাকুলভাবে আমাদের আহ্বান করিতেছেন। আমাদিগকে হৃদয়ভরা প্রেম লইয়া সেখানে ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের সমাজসংস্কার—এই প্রকারের প্রেরণাই ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে সমাজসংস্কার কার্য্যে লিপ্ত করে।

সেবাব্রত ব্রহ্মর্ষি শশিপদ আনন্দ ব্রহ্মের উপাসক। এই আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনার মর্ম্ম চিন্তা করিলে আমরা তাঁহার জীবনের অনেক রহস্য বুঝিতে পারিব। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

বরুণের পুত্রের নাম ভৃগু। ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালী বলিয়া দিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান তো আর কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। যিনি গুরু বা উপদেষ্টা তিনি ধ্যান-ধারণার প্রণালী অথবা বীজমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু শিষ্যকে তপস্যাদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

বরুণ বলিলেন,—যাহা হইতে এইসমস্ত ভূত জন্মায়, জন্মের পর যাহার দ্বারা জীবিত থাকে, শেষে আবার যাহাতে লয় পায়, চিন্তা কর তিনিই ব্রহ্ম। ভৃগু কিছুদিন তপস্যা করিয়া তাঁহার পিতার নিকট আসিলেন। বলিলেন,—অন্নই ব্রহ্ম, কারণ অন্নের সহিত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি সব মিলিয়া যাইতেছে। বরুণ কিছুই বলিলেন না। আমরা

হইলে হয় তো ভৃগুর সহিত তর্ক করিতাম, তাহাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতাম যে, তাঁহার এই মত ভুল। কিন্তু একজনের মত ভুল, ইহা যদি তাহাকে তর্ক বা যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই কি সে তাহা ছাড়িয়া উন্নততর মত গ্রহণ করিতে পারে? বরুণ এ তত্ত্ব বুঝিতেন এবং তিনি আরো বুঝিতেন যে, যিনি যে-মতেই থাকুন, সেই মতের যে-টুকু ভালো সেটুকু লইয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াই তাহার যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গলসাধন। এই প্রকারে নিজের যাহা সাধুমত তাহা লইয়া চিন্তা ও কার্য্য করার নামই তপস্যা। বরুণ ভৃগুকে অন্য কিছু না বলিয়া তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। ভৃগু আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং কিছুদিন তপস্যার পর ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে বলিলেন,—প্রাণই ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণই প্রাণে রহিয়াছে। বরুণ ভৃগুকে অন্য কিছু না বলিয়া বলিলেন,—তপস্যা কর। আবার ভৃগু তপস্যা করিলেন। তপস্যার পর তাঁহার পিতাকে বলিলেন,—মনই ব্রহ্ম। তাঁহার পিতা তাঁহাকে আবার তপস্যা করিতে বলিলেন। পুনরায় তপস্যা করিয়া আসিয়া ভৃগু বলিলেন,—বিজ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই ব্রহ্ম। এবারও বরুণ তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। পুত্র এবার তপস্যার পর আসিয়া বলিলেন,—আনন্দই ব্রহ্ম। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দম্ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

এই আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনাই ভৃগুবারুণী বিদ্যার শেষ কথা। আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনার মর্ম একটু পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি কথার প্রবর্ত্তনা করা যাইতেছে। আমাদের শাস্ত্রে একটি নিয়ম আছে, তাহার নাম "উৎসর্গ অপবাদ।" ইংরেজী ভাষায় উহার অর্থ "A higher stage in Evolution does not negate the lower ones but

fulfils them." অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের যাহা উন্নততর সোপান তাহা নিম্নতর সোপানগুলিকে উপেক্ষা, অনাদর বা অবজ্ঞা করে না, তাহাদিগকে সফল করে। আনন্দময় পরব্রহ্মের উপাসনাই সকল মতের ও সকল পথের এবং মানবীয় সাধনার সকল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়।

অধিকারিভেদে মানবের আদর্শ ও উপায় বিভিন্ন হইবেই, জগতে ইহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এজন্য যিনি বিরোধ করেন, বা দলাদলি করেন, অথবা সকলকে সমানরূপে আপনার বলিয়া উদার বক্ষে আদরের সহিত স্থান দিতে না পারেন, তিনি আনন্দময় ঈশ্বরের যথার্থ উপাসক নহেন।

পূর্ণাঙ্গ মতসহিষ্ণুতা এবং সকল ভাব ও সকল সাধনার যথার্থ সমন্বয় দর্শন করা এই অবস্থার লক্ষণ। এই অবস্থাতেই মানবের কর্তৃত্বাভিমান থাকে না—বিশ্বব্যাপার ভগবানের লীলা বলিয়া মনে হয় এবং সর্ব্বভূতেই ব্রহ্মদর্শন ঘটে। এই উপাসনায় কর্ম্ম ও জ্ঞান আসিয়া অনিমিত্তা ও অহৈতুকী ভক্তিতে সমন্বয় লাভ করিয়াছে। এই ভাবে ভগবানের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া জগতের সেবার মধ্যে যে আনন্দময়ের উপাসনা, ব্রহ্মর্ষি শশিপদর জীবনে তাহাই পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে অনেক শুভানুষ্ঠান হইয়াছে ও হইতেছে এবং ভবিষ্যতে বিস্তৃততর-রূপে আরো অসংখ্য প্রকার শুভানুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত সৎকার্য্য কিভাবে সাধন করিলে আমরা প্রকৃত সুফল প্রাপ্ত হইব, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অনেক অনুষ্ঠান প্রথমে যতখানি আগ্রহ ও আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে ততখানি ফল পাওয়া যায় না। ইহা একটা বড় নিরাশা ও দুঃখের বিষয়। আসল কথা এই

যে, কেবলমাত্র সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিয়া, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, সভার প্রকাণ্ড আপীস খুলিয়া জেনারেল কমিটি, সব্ কমিটি প্রভৃতির ব্যবস্থা করাই সফলতার চূড়ান্ত সদুপায় নহে। ইহা ভিন্ন আর একটি খুব বড় জিনিসের প্রয়োজন, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র। এই চরিত্র ব্যতীত যে-কার্য্যই করা যাউক না কেন তাহা প্রাণহীন দেহমাত্র।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ জীবনে অনেক কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহার সকল কার্য্যেই বিশেষরূপ সুফলও ফলিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি যখন যে-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখনই আপনাকে—আপনার সমগ্র হৃদয় ও সমগ্র প্রাণ সেই কার্য্যে ঢালিয়া দিয়াছেন। এই আত্মসমর্পণ তাঁহার একান্ত ভগবদ্ভক্তি এবং অবিশ্রাম প্রার্থনাশীলতা দ্বারাই সম্ভাবিত হইয়াছে। একেবারে আত্মহারা হওয়া ও সেই কার্য্যের সহিত সর্ব্বতোভাবে একাত্মতা অনুভব করাই ব্রহ্মর্ষির যাবতীয় কার্য্যের বিশেষত্ব।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বরাহনগরে এক সুরাপান-নিবারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রহ্মর্ষির জ্ঞাতি-পিতৃব্য রায় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় ইহার অনুষ্ঠান-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কোনো সাহেব বা কোনো উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিকে সভাপতির পদে বরণ করা হয় নাই। ব্রহ্মর্ষি শশিপদর পৈতৃক গুরুবংশের তৎকালীন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—ভট্টপল্লী-নিবাসী স্বর্গীয় শম্ভূনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষির জ্যেঠ্তুত ভাই শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে বনহুগ্লির জমিদার স্বর্গীয় নিমচাঁদ মৈত্রেয় এবং স্বর্গীয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ এই কার্য্যে ব্রহ্মর্ষিকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মাসে মাসে যথারীতি উক্ত সুরাপান-নিবারিণী সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। দুই একটি অধিবেশনের পর, একটি অধিবেশনে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করার পূর্ব্বে শশিপদ বাবু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। মানুষ নানাস্থানে নানাকার্য্যে লিপ্ত থাকে এবং নানারূপ মানসিক চঞ্চলতা লইয়া সভা-সমিতির কার্য্যে আসিয়া থাকে। তাহাতে কার্য্যে সকল সময়ে বেশ মনঃসংযমও হয় না, শ্রদ্ধার সহিত সকলে সকলের কথার মর্ম্মাবধারণও করিতে পারে না। কার্য্যের প্রথমে প্রার্থনা করিলে চিত্তের শান্তি বিহিত হয় এবং কার্য্যে মনোযোগও হয়। সেদিন প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে এইরূপ প্রার্থনার সুফল সকলেই অনুভব করিলেন। সভাস্থ সকলেই সভার পর স্থির করিলেন যে, এই প্রকারে প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ করাই সঙ্গত। সেইদিন হইতে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। ইহাই বরাহনগর সামাজিক উপাসনার আরম্ভ। এই সম্মিলিত প্রার্থনা হইতেই বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হইল। একটি সৎকার্য্য আর একটি সৎকার্য্য উৎপন্ন করে, তাহা আবার অন্য সৎকার্য্যে লইয়া যায়, ইহারও প্রমাণ এই ঘটনা হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে ক্রমশ ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। উক্ত সভার অধিবেশন-দিন ব্যতীত অন্য দিনও তিনি প্রার্থনা করিতেন। ক্রমে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। সুরাপান-নিবারিণী সভার কয়েকটি উৎসাহী সভ্য ব্রহ্মর্ষির সহিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন। তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের নিমিত্ত উৎসুক হইলেন এবং সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন রবিবার বনহুগলি-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিমচাঁদ মৈত্রেয় মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। সে-সময়ে নিমচাঁদ বাবু একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণার্থ তিনি অনেক অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। তৎপরে নিয়মিতভাবে ব্রহ্মর্ষির বাড়িতে সামাজিক উপাসনা হইতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষি সকলের অগ্রগামী, তাঁহাকে এইরূপ অগ্রসর দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণ উপবীত রক্ষার জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন; তাহার কারণ ব্রহ্মর্ষি শশিপদর গলায় সব সময়ে উপবীত থাকিত না। ব্রহ্মর্ষি কোনো ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হন নাই এবং তখন কোনো ব্রাহ্মসমাজের সভ্যও ছিলেন না। কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে তখনো যান নাই এবং তখন পর্য্যন্ত কোনো ব্রাহ্মের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয়ও হয় নাই। ১২৭২ সালের ২ই শ্রাবণ রবিবার কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটীতে বাবু গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 'ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতি ও স্বাধীনতা' সম্বন্ধে এক তেজস্বিনী বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ সেই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। কেশব বাবুর সেই জ্বলন্ত বাক্যসকল তাড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় ব্রহ্মর্ষির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-বিশ্বাসানলের সহিত মিলিত হইয়া শুষ্ক জাত্যভিমান-চিহ্নকে তৃণের ন্যায় ভস্মসাৎ করিল। সেইদিন হইতে জাতীয় গর্ব্বের শুভ্রহার তাঁহার গলদেশ হইতে চিরদিনের জন্য স্খলিত হইল। সেইদিন হইতেই ব্রহ্মর্ষি জাতিভেদ-বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়া পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় পতাকা ধারণ করিলেন। সেইদিন হইতেই তিনি নিজ বাটীস্থ সকলের এবং একমাত্র তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী ভিন্ন সমস্ত আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব, এমন-কি দেশের লোকের চক্ষুঃশূল হইলেন;

কয়েক দিন পরে তাঁহার এই উপবীত ত্যাগের সংবাদ Indian Daily News নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে চারিদিকে 'হৈ চৈ' পড়িয়া গেল। কেহই আর ব্রহ্মর্ষির সঙ্গে আলাপ করেন না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহার স্ত্রীকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লন। ব্রহ্মর্ষির বরাহনগরস্থ সুরা-পান-নিবারিণী সভার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণ, যাঁহারা তাঁহার সহিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন, তাঁহারাও বেগতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁহারা আর প্রকাশ্যে ব্রহ্মর্ষির সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিতেন না। এইরূপে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ সকল আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও একমাত্র সুহৃদ্ অনন্ত কালের সহায় পরব্রহ্মের নাম স্মরণপূর্ব্বক আনন্দানুভব করিতেন। একদিনের জন্যও তিনি বিমর্ষ হন নাই। শুধু আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া নহে, তাঁহার উপর যে-সকল ভীষণ উৎপীড়ন অত্যাচার হইয়াছে এবং যেরূপ প্রশান্তভাবে আনন্দের সহিত তিনি তাহা সহ্য করিয়াছেন, তাহা শুনিলেও সত্যের প্রতি দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয়। ব্রহ্মর্ষি দিনের বেলায় যতক্ষণ বাড়িতে থাকিতেন, সেই সময়ে অর্থাৎ প্রভাত হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সেই সুবৃহৎ পরিবারপূর্ণ বাটীর পরিবারবর্গের নিয়ত কোলাহল ও দুর্ব্বাক্যবর্ষণ সহ্য করিতেন। তিনি বাটী হইতে বাহির হইলে তাঁহার স্ত্রীকে একাকিনী পাইয়া বাটীর অন্যান্য নারীগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন; অশিক্ষিত স্ত্রীজন-সুলভ তীক্ষ্ণ কটুভাষা প্রয়োগে সেই সাধুশীলা রমণীর কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিতেন। কিন্তু তিনি নীরবে নিস্তব্ধভাবে সমস্ত সহ্য করিতেন। আবার সায়ংকালে ব্রহ্মর্ষি যেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, অমনি সুতীক্ষ্ণ-শরধারার ন্যায় সেই বাক্যবর্ষণ আরম্ভ হইত। ব্রহ্মর্ষি কিন্তু সেদিকে মনই দিতেন না, শুনিতে পাইলেও নিরুত্তর থাকিতেন।

একদিন রাত্রিকালে ব্রহ্মর্ষি উপরে নিজের ঘরে বসিয়া আছেন, এমন

সময়ে একটা গোলমাল শুনিতে পাইলেন। কেহ বলিতেছেন,—"উহাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও!" কেহ বলিতেছেন,—"উহাকে এর জন্য উচিত মত শাস্তি দাও।" কেহ বলিতেছেন,—"ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দাও।" ব্রহ্মর্ষি সেইসময়ে গৃহের বাহিরে ছাদের উপর আসিয়া বলিলেন,—"যা করতে হয় কোরো, এখন বৃথা গোলমাল কেন?"

একদিন সন্ধ্যার সময়ে ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী ব্রহ্মর্ষির জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের গৃহে প্রদীপ জ্বালিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহাদের প্রদীপ হইতে প্রদীপ জ্বালাইয়া লইতে নিষেধ করা হইল। তিনি আলোকশূন্য প্রদীপ হস্তে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেইসময়ে ব্রহ্মর্ষি দাসদাসী পাইতেন না, সাংসারিক সকলকাজই তাঁহারা দুইজনে করিতেন। তখন বরাহনগরে জল তুলিয়া দিবার জন্য ভারী ছিল না। গ্রামের গরীব লোকদের মেয়েরা ভদ্রলোকদিগের বাটীতে গঙ্গাজল বিক্রয় করিত। সেইসময়ে তাহারা শশিপদ বাবুকে জল দেওয়া বন্ধ করিল; সুতরাং তাঁহারা গঙ্গাজলের অভাবে বাটীর পার্শ্বস্থ পচা পুকুরের জল পান করিতেন। বন্ধুবান্ধব কেহ বাড়ি আসিলে, তাঁহারা বড় লজ্জিত ও দুঃখিত হইতেন। ইহার কিছু দিন পরে ব্রহ্মর্ষির স্ত্রীর শরীর অসুস্থ হয়, তখন রন্ধন প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কার্য্যই ব্রহ্মর্ষিকে স্বহস্তে করিতে হইত।

বাহিরে গ্রামস্থ লোকেরা ব্রহ্মর্ষিকে জব্দ করিবার নিমিত্ত সভাসমিতি করিতেন; কি উপায়ে তাঁহাকে সমাজে নিগৃহীত করা যাইবে, সর্ব্বদা তাহার জন্য চেষ্টা হইত। নাপিতকে ডাকিয়া ক্ষৌরী করিতে নিষেধ করা হইল। নাপিত তাঁহাদের কথায় ভয় পাইয়া শশিপদ বাবুকে কামানো বন্ধ করিল। তিনি কলিকাতা হইতে ক্ষুর কিনিয়া আনিয়া নিজেই কামাইতেন। রজককে ডাকিয়া ব্রহ্মর্ষিদের কাপড় কাচিতে নিষেধ করা হইল। রজক নফরচন্দ্র দাস সে নিষেধ শুনিল না। সে বলিল,—

"আমি অতি নীচ ব্যবসা করি, সাহেব ফিরিঙ্গি যবন প্রভৃতি সকলেরই কাপড় কাচি, তবে শশিপদ বাবুর কাপড় কাচিতে দোষ কি ?" রজক নফরের নিকট উচিত উত্তর পাইয়া গ্রামস্থ সকলে স্তম্ভিত হইলেন। ঐ ধোপার এই সৎসাহস আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবক-দলেরও অনুকরণীয়।• যাহা হউক, রজক যথারীতি ব্রহ্মর্ষিদের কাপড় কাচিতে লাগিল। সুতরাং এই কাজটি আর তাঁহাকে নিজের হাতে করিতে হয় নাই। ইহার মধ্যে আর একটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে; সেরূপ ঘটনা আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। একদিন প্রাতঃকালে মেথর ব্রহ্মর্ষির পায়খানা পরিষ্কার করিতেছিল, গ্রামস্থ কেহ কেহ তাহা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "আমাদের মেথর কখনই উহাদের পায়খানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না।" এইরূপ স্থির করিয়া মেথরকে ডাকিয়া নিষেধ করা হইল। মেথরের ক্ষুদ্র প্রাণ, সে ভয় পাইয়া ব্রহ্মর্ষির কাজ ছাড়িয়া দিল। সুতরাং তাঁহাকে দূর হইতে মেথর আনিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি সে-সময়ে কলিকাতায় ট্রেজারিতে Account General Officeএ কাজ করিতেন। প্রতিদিনই তিনি কয়েকটি বন্ধুর সহিত একত্র এক নৌকায় যাতায়াত করিতেন। বাবু নিমচাঁদ মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহাদের নৌকার একজন সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু শশিপদ বাবুর সহিত একত্র এক নৌকায় যাইতে নিমচাঁদ বাবুর মাতা বিশেষ আপত্তি করেন; নিমচাঁদ বাবু সে আপত্তি না শুনাতে একদিন তাঁহার মাতা নিজের মস্তকে ঘটীর আঘাত করিয়া রক্তপাত করেন, কাজেই নিমচাঁদ বাবু শশিপদ বাবুর সহিত একত্র যাওয়া রহিত করিলেন। এইরূপ আপত্তি বরাহনগরের সকল বাড়িতেই হইতে লাগিল। কেহই আর শশিপদ বাবুর সঙ্গী হইলেন না। ব্রহ্মর্ষিরও সে-নৌকায় যাতায়াত বন্ধ হইল। চলতি নৌকায়ও তাঁহাকে কেহ

লইত না। সে-সময়ে বরাহনগর হইতে সেয়ারের গাড়িও যাতায়াত করিত না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই ব্রহ্মর্ষিকে পদব্রজে বাগবাজার পর্য্যন্ত যাইতে হইত; তথা হইতে চল্‌তি নৌকায় চড়িয়া বড়বাজার যাইতেন। বাগবাজারে নৌকায় উঠিয়াও সকলদিন নিস্তার পাইতেন না। একদিন তিনি নৌকায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক শশিপদ বাবুর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিন্দা আরম্ভ করিলেন। তিনি উঁহা-দিগকে চিনিতেন না, উঁহারাও তাঁহাকে চিনিতেন না। শশিপদ বাবু মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন এবং বুঝিলেন যে, বরাহনগরের সেই ভীষণ বাত্যাসম্ভূত তরঙ্গ এখানেও আসিয়াছে। সেইসময়ে বরাহনগরে তাঁহাকে লইয়া এত আন্দোলন হয় যে, তাঁহার বন্ধুগণও গ্রামের মধ্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সাহস করিতেন না। ব্রহ্মর্ষির সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহারা কলিকাতার লালদীঘির ধারে যে-স্থানে এখন ব্ল্যাক্‌হোল মনুমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। আপীসের ছুটির পর সকলে সেই স্থানে আসিয়া মিলিত হইতেন এবং পরস্পরে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন।

একদিন ব্রহ্মর্ষি শশিপদ উত্তর বরাহনগরে কেদারনাথ মিত্র নামক কোনো ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়াছেন। তখন সেখানে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় নামক বরাহ-নগরের একজন উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষির উপবীত ত্যাগের সময়ে বিদেশে কর্ম্মস্থানে ছিলেন, অল্প দিন হইল বাটী আসিয়াছেন। তিনি শশিপদ বাবুকে দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি এমনি কাজ করেছ যে, তোমার চেয়ে খৃষ্টান্ বা মুসলমানেরাও ভালো। তুমি তাঁদের চেয়েও নীচ হ'য়েছ।" ব্রহ্মর্ষি এ সকল কথায় কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি উক্ত শম্ভুনাথ

বাবুর হস্তে হুঁকা দিলেন। কিন্তু শম্ভুনাথ বাবু হুঁকা লইয়াই—"এখানে বসে তামাক খাওয়া হবে না" বলিয়া উঠিয়া গিয়া হুঁকার জল ফেলিয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন যে, "এখন খাওয়া যেতে পারে।" এ পর্য্যন্ত শশিপদ বাবুর সহিত এরূপ হুঁকার ব্যবহার এই উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই কখনো কোথাও করেন নাই। ব্রহ্মর্ষি কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িলেন না। তিনি প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ি যাইতেন। অল্প দিনের মধ্যেই শশিপদবাবুর প্রতি তাঁহার সেই বিরূপ ভাব দূর হইয়াছিল। কেবল যে হুঁকা সম্বন্ধেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নহে, পরে তিনি শশিপদ বাবুর সহিত একাসনে বসিয়া জলযোগ করিতেও আপত্তি করেন নাই। অসদ্ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সদ্ব্যবহার দ্বারা ব্রহ্মর্ষি জয়লাভ করিলেন।

ব্রহ্মর্ষির জ্ঞাতিরা একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার জায়গা তুমি ভালো করে ঘিরে নাও, তোমাদের বাতাস যেন আমাদের এ দিকে না আসে।" ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,—"আমার অংশ আমাকে পৃথক্ করে দাও, আমি তা ঘিরে নিচ্ছি।" তখন তাঁরা এক অংশ শশিপদ বাবুকে বিভাগ করিয়া দিলেন। তিনি থাকিতেন উপরের ঘরে, বিভাগ করিয়া তাঁহাকে নীচের একটি কদর্য্য ঘর দেওয়া হইল। তাহা মানুষের বাসের অযোগ্য, পূর্ব্বে সে-ঘরে গোরু থাকিত। কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণ শশিপদ বাবু সস্ত্রীক দয়াময় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া সেই কদর্য্য গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গৃহে গমনাগমনের জন্য তাঁহারা গৃহের সম্মুখে পথও পাইলেন না; তাঁহাদিগের বাটীর পশ্চাতে বনের মধ্য দিয়া এক অপরিষ্কার পথ দেওয়া হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মের জন্য এরূপ নির্য্যাতন এবং এরূপ বাসের ক্লেশ আর কেহ সহ্য করিয়াছেন কি না জানি না। ঐ গৃহে ঐরূপ ক্লেশের

সহিত বাস করিবার সময়ে ব্রহ্মর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যপ্রকাশের জন্ম হয়। সে-সময়ে তাঁহাকে যেরূপ দুর্ব্বিষহ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

সেবাব্রত শশিপদ বাবু ঐ গৃহের পশ্চাতে নূতন দরজা বসাইয়া বাহিরে যাইবার নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং কিছুদিন পরে উপরে একটি ঘর করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইট্ সুরকি প্রভৃতি সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে, রাজমিস্ত্রী কার্য্যারম্ভ করিল; সিঁড়ি তৈরী হইতেছে, এমন সময়ে আর এক প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মাঘ ব্রহ্মোৎসবের দিন ব্রহ্মর্ষি শশিপদ সস্ত্রীক কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন। সেইবার প্রথম আদি সমাজে মহিলাদিগের বসিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ইঁহারা আদি সমাজে প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপনান্তে কেশব বাবুদের সহিত সমস্ত দিনব্যাপী উৎসবে যোগদান করেন। ব্রহ্মর্ষির সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেদারনাথও গিয়াছিলেন। উৎসবান্তে তাঁহারা বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, কিঞ্চিৎ প্রশমিত অগ্নি পুনর্ব্বার প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়াছে। এবার স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পুরুষেরাও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। কাহার সাধ্য সে ঝড়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়! স্ত্রীলোকেরা ভাবিলেন,—যখন স্ত্রীকে লইয়া গেল, তখন ক্রমে ক্রমে আমাদিগকেও লইয়া যাইবে। পুরুষেরা ভাবিলেন,—এবার যখন ভাইকে লইয়া গিয়াছে, তখন ক্রমশ বাটীর অন্যান্য ছেলেদিগকেও লইয়া যাইবে। সুতরাং উহাদিগকে আর এ বাটীতে কখনই থাকিতে দেওয়া হইবে না।

শশিপদ বাবু বাড়িতে পৌঁছিবামাত্র সকলে তাঁহাকে অনেক কটূক্তির পর সক্রোধে বলিলেন,—"তুমি বাটী হইতে বহির্গত হও, এ বাটীতে

কখনই আর তুমি থাকিতে পাইবে না।" ব্রহ্মর্ষি অন্ত সকল কটূক্তির কোনো উত্তরই করেন নাই। কেবল বলিলেন,—"এ বাড়িতে যদি নিতান্তই আমাকে থাকৃতে না দাও, তবে আমার অংশের মূল্য আমাকে দাও, আমি অন্ত জায়গায় চলে যাচ্ছি।" জ্ঞাতিরা বলিলেন,—"এখন তো তুমি যাও, পরে তোমার অংশ তোমাকে দেওয়া যাবে।" শশিপদ বাবু বলিলেন,—"তা হবে না, আমার অংশ যখন আমাকে দেবে, আমিও তখনই যাব।" তাঁহারা শেষে অন্ত উপায় না দেখিয়া, শশিপদ বাবুর নিজাংশ সম্পত্তির মূল্যস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি পৈতৃক বসতবাটী হইতে উঠিয়া বরাহনগরে রামভট্টের ভাড়াটে বাড়িতে আসিলেন এবং ঐ দিনই বর্ত্তমান বসতবাটীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার পরে একদিন ব্রহ্মর্ষির শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান আসে। ব্রহ্মর্ষির শ্বশ্রূঠাকুরাণী বহুদিন কন্যাকে দেখেন নাই, সুতরাং তিনি অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইয়া কন্যা-জামাতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ব্রহ্মর্ষি সপরিবারে প্রাতঃকালে নৌকারোহণ করিয়া আড়িয়াদহ গ্রামে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বাড়ির ভিতরে গমন করিলেন, এ-দিকে বহির্বাটীতে গ্রামস্থ লোকেরা সভা করিয়া বসিলেন। সেই সভার উদ্দেশ্য সপরিবারে শশিপদ বাবুকে তখনি বাহির করিয়া দেওয়া। তাঁহারা যদি সে-বাটীতে আহারাদি করেন, তাহা হইলে শশিপদ বাবুর শ্বশুর মহাশয়কে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। ব্রহ্মর্ষির শ্বশুরকে বলা হইল,—"তোমার মেয়ে-জামাইকে এই দণ্ডেই বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দাও, নতুবা তুমি জাতিচ্যুত হইবে।" ব্রহ্মর্ষির শ্বশুর মহাশয় বাষ্পাকুল-লোচনে বাড়ির ভিতরে গিয়া এইসকল কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছু না খাওয়াইয়া

কন্যা-জামাতাকে কিরূপে বিদায় দিবেন? ওদিকে স্বামী তাড়া দিতেছেন, তাই তাড়াতাড়ি কন্যাকে কিছু খাওয়াইয়া দিলেন, জামাতার আর আহার হইল না। শশিপদ বাবু সস্ত্রীক সত্বর আসিয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ভ্রমণান্তে রাত্রিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিংশতি বর্ষ বয়সে আড়িয়াদহের প্রসিদ্ধ ঘোষাল-বংশের মদনমোহন ঘোষালের পৌত্রী, ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয়ের কন্যা রাজকুমারী দেবীর সহিত শশিপদ বাবুর বিবাহ হয়। বিবাহের পর একবৎসর কাল রাজকুমারী দেবী পিত্রালয়ে ছিলেন; একবৎসর পরে পতিগৃহে আসেন। শশিপদ বাবু সেইসময়েই নিজ স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হন। তখন এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হয় যে, যিনি আমার সহধর্ম্মিণী হইলেন, তিনি যদি আজন্ম অজ্ঞানান্ধকারে থাকেন, তবে কিরূপে তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিব? তিনিই বা কিরূপে সংসার-কাননে আমার সহায় হইবেন? অশিক্ষিতা রমণীগণ ধর্ম্মাচরণের বিঘ্নকারিণী এবং সংসারের কণ্টকস্বরূপ, অতএব আমার স্ত্রীকে জ্ঞান-চক্ষু দান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমে লেখাপড়া শিখানো ভিন্ন আর কোনো উপায়ে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া তিনি নবোঢ়া পত্নীকে লেখাপড়া শিখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ব্রহ্মর্ষি বলেন, যে-পুরুষ আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, তিনি স্ত্রীকে সঙ্গিনী করিবেন; নতুবা একাকী কখনই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। যদি কেহ স্ত্রীকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজেই সম্মুখে ধাবমান হন, নিশ্চয় জানিবে যে তাঁহাকে পুনর্ব্বার পশ্চাতে ফিরিয়া স্ত্রীর অধিষ্ঠিত নিম্নভূমিতে আসিতে হইবে। পুরুষ অপেক্ষা নারীর আকর্ষণী শক্তি অধিকতর বলবতী, অতএব যথার্থ আত্মো-

উন্নতি-লাভার্থী পুরুষগণ অবশ্যই স্ত্রীকে উন্নত জীবনপথের সহগামিনী করিবেন। যদিও স্ত্রীকে ফেলিয়া স্বয়ং আত্মোন্নতি লাভ করিতে কোনো কোনো মহাপুরুষ সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই কারণেই এ-দেশের সাধারণের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্মর্ষি আরো বলেন যে, আমরা সাধারণত দুই প্রকারের স্ত্রী দেখিতে পাই—উত্তম ও অধম। উত্তম স্ত্রী জেলেদের মাছধরা জালের উপরের শোলার ন্যায়, অর্থাৎ জালের উপরিস্থ শোলা যেমন জালকে জলে একেবারে ডুবিতে দ্যায় না—উপরে ভাসাইয়া রাখে, উত্তম স্ত্রী ও সেইরূপ সংসার-সাগরে নিমজ্জমান পুরুষকে ডুবিতে না দিয়া ভাসাইয়া রাখে। আর অধম স্ত্রী উক্ত জালের নিম্নস্থ লোহার কাঠিস্বরূপ, অর্থাৎ উক্ত লোহার কাঠি যেমন জালকে জলের নীচে ডুবাইয়া দ্যায়, অধম স্ত্রীও সেইরূপ পুরুষকে আরো ডুবাইয়া দ্যায়।

ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী প্রথমে ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। পৌরাণিক প্রবাদে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদিনী ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন, আর বেলা এগারোটার সময় বহির্গত হইতেন। ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার প্রস্তাব করিলে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন, তিনি বলিতেন, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়। ব্রহ্মর্ষিও কর্ত্তব্যবিমুখ হইবার লোক নহেন। তাঁহার মতবিরুদ্ধ ব্যক্তিকে স্বমতে আনিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি যে-কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হন না। ক্রমশ যুক্তিতর্ক ও উপদেশাদির দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখিতে সম্মত করাইলেন। এইসময়ে ব্রহ্মর্ষি কিছু দিন আহারান্তে নির্জ্জনে গভীর চিন্তা ও প্রার্থনায় অতিবাহিত করিয়াছেন। নিজ স্ত্রীর কুসংস্কার দূর করিয়া সদুপদেশের দ্বারা তাঁহাকে সৎ

পথে আনয়ন করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। বলপূর্ব্বক বা ভয় দেখাইয়া নিজ স্ত্রীকে নিজের মতে আনা সহজ, কিন্তু সদুপদেশপূর্ণ মিষ্টবাক্যে কুসংস্কার-পঙ্ক ধৌত করিয়া সৎপথের দিকে আনয়ন সহজ ব্যাপার নহে।

ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী যাই স্বামীর নিকট প্রথম শিক্ষা পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন, অমনি বাটীর মধ্যে, গ্রামের মধ্যে—চারিদিকে "হুলুস্থুল" পড়িয়া গেল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের নিয়মিত শিক্ষা এ-দেশে এই আরম্ভ—এই প্রথম। স্যার রাধাকান্ত দেবের বাটীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল বটে, কিন্তু সমবেতভাবে বয়স্থা স্ত্রীলোক-দিগের শিক্ষার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে এ-দেশে আর ছিল না। কেশব বাবু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। একে তো বই পড়া, তাহাতে আবার স্বামীর কাছে! এই দুইটিই তখনকার দেশাচারের ঘোর বিরুদ্ধ। তখন নবীনা স্ত্রীর দিবসে স্বামীর সহিত কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। কদাচিৎ কোনো প্রগল্‌ভা এই নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাকে অশেষ প্রকার বিদ্রূপ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। তখনকার দিনে প্রায় অধিকাংশ লোকই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অধীন হইয়া দৃঢ় নির্ভরতার সহিত সেইসকল অলীক নিন্দা অগ্রাহ্য করিলেন, কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি নিয়মিতরূপে নিজ স্ত্রীকে লইয়া পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীও পরে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই অক্ষর পরিচয় সমাপ্ত করিয়া সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

শশিপদ বাবুর স্ত্রীর এইরূপ পাঠোন্নতি দেখিয়া তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ লেখাপড়া শিখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ব্রহ্মর্ষির স্ত্রীই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। শিক্ষাদান-কার্য্যে এই তাঁহার প্রথম হাতে খড়ি। এইরূপে দুই একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সুবৃহৎ

পরিবারপূর্ণ বাটীর বালিকা, বয়স্থা, প্রৌঢ়া, বিধবা সকলেই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মর্ষিও উৎসাহী হইয়া যত্নের সহিত সকলকে. পড়াইতে লাগিলেন। সে-সময়ে বরাহনগরের ভদ্র গৃহস্থ-রমণীরা বৃথা সময় কাটাইতেন না, গৃহকার্য্য সমাপনান্তে যতটুকু সময় থাকিত, তখন নানারূপ ঘুন্‌শী বিনানো এবং আলাপাদি করিতেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ যখন তাঁহাদিগের মানসিক স্রোত ফিরাইয়া লেখাপড়ার দিকে আনিলেন, তখন তাঁহাদের বাড়ির মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। যাঁহারা একদিন স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, যাঁহারা ইহার জন্য ব্রহ্মর্ষিকে কত অনুযোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তাঁহার ঐন্দ্রজালিক কৌশলে পুস্তক হস্তে করিয়া তাঁহারই নিকট পড়িতে বসিলেন। এখন অনেকেই বালিকা বিদ্যালয়ে বা কলেজে বয়স্থা রমণীদিগকে বেঞ্চের উপরে বসিয়া নিরুদ্‌বেগে পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু কখনো ভূতল-সংলগ্ন আসনোপরি উপবিষ্টা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী লজ্জাকুণ্ঠিতা সচকিতনয়না রমণী-দিগের মৃদু-মধুর পাঠধ্বনি শুনিয়াছেন কি? তাই বলিতেছি যে, সে এক নূতন প্রীতিপ্রদ পবিত্র সুন্দর দৃশ্য।

ক্রমশ শশিপদ বাবুদের বাড়িতে পাড়ার মেয়েরাও আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মর্ষি যখন দেখিলেন যে, বাহিরের মেয়েরা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পড়িতে আসে, তখন তিনি (১৮৬৫ খৃঃ ১৯শে মার্চ্চ) তাঁহাদের পৈতৃক বাটীর সম্মুখে দীননাথ নন্দীর পূজার দালানে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বলিখিত "বরাহনগর সুরাপান নিবারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঈশ্বরপ্রেমই মানবপ্রেমের উৎস। যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরকে প্রীতিদান করিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম প্রকাশ পায়। ঈশ্বর-

প্রেমই মানবপ্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম সঞ্চারিত হয় নাই, তিনি কিছুতেই মানুষমাত্রকেই নির্ব্বিশেষে ভালোবাসিতে পারেন না। ঈশ্বর-কৃপায় যে-ভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে তাঁহার প্রতি সরল অকপট প্রেম সমুজ্জ্বলরূপে বিভাসিত হয়, তিনি কী বিমলানন্দ অনুভব করেন! যখন সেই আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া তিনি বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হন, তখন সকল নরনারীকেই ভ্রাতা-ভগিনী জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন। সে-সময়ে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়, জাত্যভিমান দূরে পলায়ন করে। চৈতন্যদেব এই প্রেমে উন্মত্ত হইয়াই যজ্ঞোপবীত গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, হিন্দুর অস্পৃশ্য যবনের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রুনীরে ভাসিয়াছিলেন। যাঁহার হৃদয়-সরসীতে একবার সে-প্রেম-শতদল প্রস্ফুটিত হয়, তিনি তাঁহার সুরভি পরিমল চতুর্দ্দিকস্থ সকলকে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি তখন এইভাবে বিহ্বল হন যে, আমার পরম পিতার প্রদত্ত এই মনোহর পুষ্পের সৌরভ গ্রহণ করিতে যখন পাপী পুণ্যবান্, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র সকলেই সমান অধিকারী, তখন আমি আমার প্রেমকে কি সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ রাখিতে পারি? এই সময়ে তাঁহার কৃত্রিম জাতিভেদ-বন্ধন,—তথাকথিত নীচ জাতির প্রতি ঘৃণা, অলক্ষিতভাবে স্খলিত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বাধামুক্ত স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবলবেগে প্রেমানন্দ-নীরে সকলকে ভাসাইয়া সেই অনন্ত সাগরাভিমুখে প্লাবিত হন।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ এই জগজ্জয়ী ঈশ্বর-প্রেমে মত্ত হইয়া উচ্চ জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সেই বিশ্বোন্মাদকারী প্রেম-তটিনীর প্রবল স্রোত, বহুকালের দৃঢ়বদ্ধ উচ্চ জাতীয় গর্ব্বের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরস্বরূপ বক্ষঃপৃষ্ঠ-বেষ্টিত যজ্ঞসূত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল, এবং তাহার পবিত্র নীরে হৃদয়-ক্ষেত্র বিধৌত করিয়া আভিজাত্য-গর্ব্ব-বৃক্ষের

মূলোৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। ব্রহ্মর্ষির হৃদয়ে আর জাতিভেদজ্ঞান স্থান পাইল না। তিনি চণ্ডালকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, চণ্ডালপত্নী তাঁহার হৃদয়ে সহোদরার আসন পাইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে তিনি বনহুগ্‌লির চণ্ডাল-পল্লীতে গমন করেন। যে চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিলে অবগাহন করিতে হইত, তিনি সেই চণ্ডালদিগের সহিত একাসনে বসিতেন, তাহাদের পাড়ায় গিয়া সকলের সংবাদাদি লইতেন, এবং তাহাদের কার্য্যব্যস্ততা জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। সন্ধ্যাকালে কার্য্য হইতে অবসৃত হইলে তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনাদি করিতেন। এইরূপে কিছুদিন ব্রহ্মর্ষির যাতায়াতে তাহাদের চিত্তে নানারূপ অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে এবং এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই তাহারা বরাহনগরের সকল সভাসমিতিতে উপস্থিত হইত। দুঃখের বিষয় ব্রহ্মর্ষি শশিপদ স্থান পরিত্যাগ হেতু এবং অন্যান্য নানা কার্য্যের জন্য আর তাহাদের নিকট যাইতে পারিলেন না, তাহাদিগকে দেখিতে পারিলেন না, তজ্জন্যই তাহাদের সেই অনুসন্ধিৎসা অন্য দিকে যায়—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম্ম কেহ বা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বরাহনগরের শ্রমজীবী দলের সহিত অত্যন্ত নিবিড়-ভাবে মিশিয়াছেন, সেই দল কাওরা প্রভৃতি হিন্দু সমাজের অতি নিম্ন-স্তরের ঘৃণিত অস্পৃশ্য ইতর জাতীয় লোকদের লইয়া গঠিত। ব্রহ্মর্ষি সেই দলের সহিত একত্র উপবেশন ও একত্র ভোজন করিতেন। কখনো কখনো তিনি বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের জন্য তাহাদিগকে লইয়া দূর-ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এইরূপ একবার নৌকাযোগে ব্যারাকপুরে গমন করিয়া তথায় তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পরমানন্দে ভোজন

করেন। মাঘোৎসবের সময়ে কোনো কোনো বার তিনি এই শ্রমজীবী দলের সহিত বরাহনগর হইতে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথায় তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিভোজনে যোগদান করিতেন। কোনো উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণের পক্ষে তখনকার কালে ইহা অল্প উদারতার পরিচয় নহে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ সাধারণ লোক-দিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার উপকারিতা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, এবং সেই দিনেই নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে উক্ত নৈশ বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইল। শশি-পদ বাবু দিনের বেলায় আপীসের কাজ করিয়া রাত্রিতে উক্ত শ্রমজীবী দিগকে পড়াইতেন। আপীসের কাজ ছাড়া বরাহনগরের অন্যান্য সৎ-কার্য্যে ব্রহ্মর্ষিকে নিযুক্ত থাকিতে হইত, সুতরাং তিনি বেশি দিন এই নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াইবার অবসর না পাওয়ায় কয়েকজন বন্ধুর উপরে পড়াইবার ভার দিলেন। পরে যখন দেখিলেন, অবৈতনিক শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না, তখন মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে এডিন্-বরার সুবিখ্যাত খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্য ডাক্তার আলেক্জাণ্ডারের পুত্র উইলিয়ম আলেক্জাণ্ডার বোর্ণিয়ো কোম্পানীর কলিকাতাস্থ আপীসের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সহিত ব্রহ্মর্ষির বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। একদিন ব্রহ্মর্ষি কলিকাতায় তাঁহাদিগের আপীসে যাইয়া তাঁহার সহিত শ্রমজীবী-দিগের উন্নতিকর কার্য্য সম্বন্ধে আলাপ করেন, সে-স্থানে আপীসের অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারিগণও ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদের সকলের নিকটেই ইহার সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, নৈশ

বিদ্যালয় আলমবাজারের কলবাটীর মধ্যে হইলে ভালো হয়। তাঁহারা সকলেই সাদরে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার সাহেব ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য কলের অধ্যক্ষ মেয়ার সাহেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। মেয়ার সাহেব ঐ পত্র পড়িয়া বলিলেন, একটা জমি কেনা যাইতেছে, তাহা হইলেই ইহার ব্যবস্থা করা যাইবে। পরে ১৮৬৯ সালের ১৪ই জুন তারিখে মেয়ার সাহেব কলবাটীর মধ্যে একটি সুন্দর বাংলো প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। ঐ তারিখে পূর্ব্বোক্ত নৈশ বিদ্যালয় সেই ঘরে উঠিয়া গেল এবং ইহার সমস্ত ব্যয়ভার কোম্পানী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শশিপদ বাবুই অধ্যক্ষ রহিলেন। হায়, এই সুবিধা বেশি দিন রহিল না। অল্পদিন পরে একদিন কল হইতে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া বিদ্যালয়-গৃহের চালে পড়িল, তাহাতেই গৃহখানি ভস্মসাৎ হইয়া যায়। কোম্পানী পুনর্ব্বার গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অগ্নিভয় নিবারণের জন্য এবার টিনের ছাদ করা হইল। এই বাটীর নক্‌সা ব্রহ্মর্ষি নিজেই করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই রবিবার নৈশ বিদ্যালয় এই নূতন গৃহে পুনর্ব্বার উঠিয়া গেল। ঐ দিন ঐ গৃহে তিন শত শ্রমজীবী একত্র হয়। ব্রহ্মর্ষি দেড়ঘণ্টা কাল ধরিয়া সামান্য লোকদের উপদেশমূলক একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বিদ্যালয়ের ব্যয় বোর্ণিয়ো কোম্পানী বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রমজীবী-দিগের শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য, এই শিক্ষাদান কার্য্যেও ব্রহ্মর্ষিকে বিপক্ষতাচরণ সহ্য করিতে হইয়াছিল! স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের তাঁহার প্রতি আক্রোশের কারণ এই যে, একে তো বরাহনগরে কল হওয়া অবধি দাস দাসী পাওয়া দুষ্কর, সামান্য লোকেরা ভদ্রলোকদিগকে গ্রাহ্যই করে না; তাহাতে আবার ইহারা লেখাপড়া শিখিলে ভদ্রলোকদের আর মান প্রতিপত্তি থাকিবে না। এই সমস্ত

অনিষ্ট পাতেরই মূল শশিপদ বাবু ; সুতরাং অনেকেই তাঁহার বিরোধী হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ চরিত্র প্রভৃতির দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি দৃষ্টি রাখিতেন। যাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সচ্চরিত্র সুনীতিপরায়ণ হয়, যাহাতে তাহারা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং সম্মানিতের সম্মান করিতে শিখে, যাহাতে তাহারা পারিবারিক কর্ত্তব্য, কর্ম্মস্থানের কর্ত্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হয়, ব্রহ্মর্ষি সেইবিষয়ে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। একদিন কলের এক সাহেব (ক্রোল) বিদ্যালয় গৃহে বক্তৃতার সময়ে বলিয়াছিলেন,—"কল ঘরে যাহারা কাজ করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা শশিপদ বাবুর নাইট্ ইস্কুলের ছাত্র, আমি দেখিয়াছি তাহাদের কার্য্যই উত্তম হয়।"

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ উত্তর বরাহনগর ভিন্ন অন্য স্থানেও নাইট্ ইস্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে শ্বশুরবাড়ির নিকটে আড়িয়াদহ গ্রামে একটি নাইট্ ইস্কুল সংস্থাপন করেন। পরে বিলাত হইতে আসিয়া কামার পাড়ায় একটি ও কুটীঘাটায় একটি নাইট্ ইস্কুল করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তারিখে ব্রহ্মর্ষি শ্রমজীবী সভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। বরাহনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের দোকানদার, কারিকর, কুলি মজুর ও কর্ম্মচারী প্রভৃতি সামান্য লোকদিগের চরিত্রগঠন, অবস্থার উন্নতি, হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক প্রভৃতি উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল। শ্রমজীবী-দিগকে শিক্ষাদান, উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা, বিশুদ্ধ আমোদ, মাদক দ্রব্য সেবন নিবারণের চেষ্টা প্রভৃতি সভার প্রধান কার্য্য ছিল। এই সভার সভ্যদিগকে সুরাপান নিবারিণী সভারও সভ্য হইতে হইত। বিশুদ্ধ

আমোদ উপভোগের জন্য এইসকল শ্রমজীবীদিগকে লইয়া ব্রহ্মর্ষি মাঝে মাঝে ভ্রমণে বাহির হইতেন। একবার ৫০।৬০ জন শ্রমজীবী সহ নৌকাযোগে এইরূপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মর্ষি তাহাদের সহিত প্রীতি-ভোজন ও অন্যান্য বিশুদ্ধ আমোদে যোগদান করেন। ঐ সংবাদ ইংলণ্ডের শ্রমজীবী সভার অধ্যক্ষেরা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্ণগোচর করাইয়াছিলেন। কলিকাতায় Daily News পত্রে ঐ ঘটনার এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল,—"গত রবিবার বরাহনগরে যে ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা ভারতের অন্য কোনো অংশে আর কখনো দেখা যায় নাই। ৫০ জন উৎসাহী শ্রমজীবীর সহিত মিলিত হইয়া একস্থানে যাত্রা করা বিলাতে একটি সামান্য ঘটনা, কিন্তু এ দেশের পক্ষে ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে।"

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নব বার্ষিকী' পত্রিকায় ব্রহ্মর্ষি শশিপদর তৎকালীন কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বর্ণিত হয়। তাহাতে শ্রমজীবীদিগের জন্য কার্য্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শ্রমজীবীদিগের উন্নতিসাধনের দিকেই ইঁহার (শশিপদ বাবুর) অধিকতর চেষ্টা ও উদ্যম লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনকল্পেও ইঁহার বিশেষত্ব আছে। সামান্য লোকদিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বরাহনগরে যত চেষ্টা হইতেছে, আমাদের দেশের আর কোনো স্থানেই সেরূপ চেষ্টা লক্ষিত হয় না। এমন কি, শ্রমজীবীদিগের উন্নতিকল্পে ইনিই প্রথম প্রস্তুত ও যত্নবান্ হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত একমাত্র ইনিই সেই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। আর কোথাও যদি এ সম্বন্ধে কিছু হয়, তবে তাহা ইঁহারই সাধু দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া হইবে। ইঁহার নাম এই কার্য্যের দ্বারাই প্রধানরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রমজীবীদিগের সামাজিক উন্নতিসাধনের নিমিত্ত "শ্রমজীবী সভা" (Working mans' institiution) এবং তাহাদের ধর্ম্মোন্নতি সাধনের নিমিত্ত "সাধারণ-ধর্ম্মসভা' সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রমজীবীরা আপন আপন আয়ের কিছু কিছু অংশ যাহাতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, এই নিমিত্ত ইনি অনেক চেষ্টা করিয়া বরাহনগরে একটি গবর্ণমেণ্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্কও সংস্থাপন করাইয়াছেন।"

শ্রমজীবীদিগের বাটীতে এই শ্রমজীবী সভায় বিশেষ বিশেষ অধিবেশন হইত। ঐ সকল সভায় ব্রহ্মর্ষি সরল ভাষায় অনেক উপদেশ দিতেন। শ্রমজীবীদিগের স্ত্রী কন্যা ভগিনী প্রভৃতি রমণীরা আগ্রহের সহিত ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে এই সভায় উপস্থিত হইতেন। উক্ত রমণীগণেরও বিশেষ যত্ন ও উৎসাহপূর্ণ ভাব লক্ষিত হইত। ব্রহ্মর্ষির আন্তরিক যত্নে এবং দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায়ে এই সভা শীঘ্রই স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিল। যেসকল শ্রমজীবী পূর্ব্বে সুরাপান করিত, তাহারা আর সুরা স্পর্শ করে নাই; যাহারা কোনোরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিত না তাহারা চিরদিনের জন্য উহা হইতে দূরে রহিয়াছে। সকলেরই প্রাণে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সাধারণ ধর্ম্মসভার সভ্য ছিল, এবং নিয়মিতরূপে ধর্ম্মসভার সহিত যোগ রাখিত। উৎসাহের সহিত সকলেই নৈশ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, ইহারা কোনো কুসংসর্গ বা কুৎসিৎ আমোদে লিপ্ত হইত না। এইজন্য ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থ উদ্‌বৃত্ত হইয়া সঞ্চিত হইত। ইহাদিগের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি পূর্ব্বোক্ত সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে কেবল কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বম্বেতে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ছিল, পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট প্রতি জেলায় ও প্রতি মহকুমায় সেভিংস ব্যাঙ্ক খুলিবার জন্য একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। ব্রহ্মর্ষি সেই মন্তব্য ও

প্রস্তাবিত সেভিংস্ ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী পাঠ করিয়া বরাহনগরে সেইরূপ একটি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খুলিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বরাহনগর জেলাও নহে মহকুমাও নহে, সুতরাং তথায় উক্ত ব্যাঙ্ক খোলা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল না। ব্রহ্মর্ষি বিশেষ যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এখন অবশ্য সকল স্থানেই ডাকঘরের সঙ্গে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদর সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা অতুলনীয়। কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, অবিচলিত দৃঢ়তা সহকারে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আর যাহা অসত্য ভ্রম বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া বুঝিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, বীরপরাক্রমে তাহার মূলোৎপাটন করিয়াছেন। ভ্রম কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসানুযায়ী সত্য ও কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপন্ন করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা বর্ণনাতীত। অনুষ্ঠান-কর্ত্তা ভিন্ন তাহার দুরতিক্রমণীয় বাধা সকল এবং গুরুত্ব অনুভব করিতে আর কেহই সক্ষম নহেন। যেমন যে-যোদ্ধা একাকী সম্মুখ যুদ্ধে বিক্রমশালী সশস্ত্র যোদ্ধাকে পরাস্ত করিয়া জয়লাভ করেন, সেই যোদ্ধার দৈহিক বল ও পরাক্রম তাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই অনুভব করিতে পারেন না, সেইরূপ ধর্ম্মবীরেরা একাকী এক অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে সহায় করিয়া যেরূপে প্রচুর বলশালী দুর্নিবার মিথ্যা দেশাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হাজার হাজার কুসংস্কারপূর্ণ কুতর্ক-শক্তিকে পরাস্ত করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদের মানসিক বল ও পরাক্রম তাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে সক্ষম নহেন।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ দেখিলেন যে, আমাদের দেশের সূতিকাগার দ্বিতীয়

যমমন্দির! সে-গৃহে সুস্থকায় ব্যক্তির তিন রাত্রি বাস করিলে পীড়া হয়, সেইরূপ গৃহে বলহীনা অসুস্থা প্রসূতিকে প্রায় একমাস যাবত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, এবং প্রসূতির পথ্যাপথ্যের যে ব্যবস্থা সে একরূপ কঠোর শাস্তি। ইহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কখনই করুণাময় বিধাতার নিয়ম নহে—মানুষের কুসংস্কারের ফল। সূতিকাগৃহ কিরূপ হওয়া উচিত এবং প্রসূতিকে কিরূপ নিয়মে রাখা আবশ্যক, ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থ দেখিয়া এবং দুই একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের সহিত আলাপ করিয়া ব্রহ্মর্ষি শশিপদ তাহা স্থির করিলেন এবং প্রচলিত জঘন্য প্রথা দেশ হইতে দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এ আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, সে সময়ে বরাহনগরের সমস্ত ভদ্র গৃহেই পূর্ব্ব প্রথানুসারে সূতিকালয় নির্ম্মিত এবং সেই প্রণালীতেই প্রসূতিগণের সেবা হইত।

এই সময়ে ব্রহ্মর্ষির দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। স্বীয় পত্নীর সূতিকাগার তিনি নিজ বিশ্বাসানুসারেই ঠিক্ করিলেন। প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ প্রথা বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করিলেন না। একে তো ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মর্ষি উপবীত ত্যাগ করিয়া ভীষণ নিগ্রহ সহ্য করিতেছিলেন, তাহাতে আবার এই কার্য্যে তাঁহাদের বাটীর সকলে ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া নানারূপ বাধা দিতে লাগিলেন। বহু পরিবারপূর্ণ বাটীর একটি প্রাণীও সে-সময়ে ব্রহ্মর্ষির সাহায্য করিতে আসিলেন না, বরং যাহাতে বিঘ্ন হয় সকলেই তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিষেধে ধাত্রী পর্য্যন্ত আসিল না। কিন্তু ভগবান্ অসহায়ের সহায়, যে তাঁহার পথে চলিতে চায়, তিনি তাহার সহায় হন। সেইসময়ে একটি বিদেশীয় অপরিচিতা রমণী শশিপদ বাবুর নিকট কাজের নিমিত্ত উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে যত্নের

সহিত রাখিলেন। সেই রমণী সূতিকালয়-জননীর ন্যায় শশিপদ বাবুর পত্নীর ও নবজাত শিশুর সেবা শুশ্রূষা করিল। পরে ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী সুস্থ হইলে ঐ পরিচারিকা অন্যত্র চলিয়া গেল। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিধাতা ঐ রমণীকে এই কার্য্য উদ্ধারের জন্যই পাঠাইয়াছিলেন। এই ঘটনাটির ভিতরে আমরা দুইটি আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাই,—একটি ব্রহ্মর্ষির অটল বিশ্বাস, বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দেশাচার কুলাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অসাধারণ সাহসের সহিত দেশস্থ পল্লীস্থ ও নিজবাটীস্থ ব্যক্তিবর্গের বিপুল বাধারাশি তৃণের ন্যায় দলিত করিয়া একাকী স্বীয় বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপরটি ভগবানের কৃপা। পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা যদি সে-সময়ে উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে শশিপদবাবুকে কি ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে হইত। অধিক কি, তাঁহার পত্নীর জীবন রক্ষা কঠিন হইত। কিন্তু যিনি জীবনদাতা তিনি রক্ষা করিলে কার সাধ্য নষ্ট করে? "যে ভগবানের পথে চলে স্বয়ং ভগবান্ তাহার সহায় হন"। এ প্রবাদ মিথ্যা নহে, ঈশ্বরবিশ্বাসী ধার্ম্মিকের জীবনে ইহা ধ্রুব সত্য।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বালকবালিকাদিগকে আন্তরিক ভালোবাসেন। তজ্জন্য তাহারাও তাঁহার বাধ্য হয়। তিনি যাহা বলেন তাহা শুনে। যে-শিশুর রোদন ও বায়নার অস্তিত বস্তুর প্রার্থনাতে জননী পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, ব্রহ্মর্ষি মাত্র দুইটি মিষ্ট কথায় তাহাকে নিরস্ত ও সন্তুষ্ট করিতে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সরস মিষ্ট বাক্যের কেমন এক আশ্চর্য্য শক্তি! বিশেষত তিনি বালক বালিকাদিগের প্রীতিকর এমন সব গল্প বলিতে পারেন, যাহা কোনো পৌরাণিক পুস্তকাদির অন্তর্গত নহে, অথচ তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত থাকে; সেই নূতন নূতন অদ্ভুত গল্প নৈতিক উপদেশে পূর্ণ।

চঞ্চলচিত্ত বালকবালিকাগণ তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কলিকাতায় থাকিতে তিনি সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দিতেন। একদিন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ে বালকবালিকাদিগকে গোলমাল করা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ঐ সকল বালকবালিকা কাজের সময়ে বড় গোলমাল করিত, তাহাতে কাজের অনেক ব্যাঘাত হইত, তাহা দেখিয়াই ব্রহ্মর্ষি সেদিন গল্পচ্ছলে এমন একটি উপদেশ দিলেন যে, সেইদিন হইতে তাহারা আর গোলমাল করিত না। যেসকল বালক-বালিকা সেদিন সে-বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল না, ব্রহ্মর্ষির আশ্চর্য্য বাক্যশক্তি তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়াছিল। সেইদিন হইতে নিজ নিজ বাড়িতে ভোজনকালেও কোনো বালকবালিকা গোলমাল করিত না। একদিন স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের বাটীতে ছাদের উপরে একটি ভোজ হইতেছিল, উক্ত ভোজসভায় বালকবালিকাদের নীরব নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া সকলে ব্রহ্মর্ষিকে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আমরা অনেক চেষ্টা করেও যে কাজে কৃতকার্য্য হতে পারি নি, আপনি একদিনেই তা সম্পন্ন করেছেন।" ইহার পূর্ব্বে আহারের সময়ে ইহারা এত গোলমাল করিত যে, সকলেই বিরক্ত হইতেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্ত্রী বালকবালিকাদিগকে অতি ধীর ও মিতভাষী দেখিয়া ব্রহ্মর্ষির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সমাজপাড়ায় বরদা বাবুর বাটীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংসৃষ্ট যে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ব্রহ্মর্ষি শশিপদ তাহার সম্পাদক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষির পত্নী এবং ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (তখন বসু) ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। একবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবের পরে উত্তরপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব পালের বাগানে উদ্যান-সম্মিলন

হয়। সেখানে সমাগত কয়েকটি দুরন্ত বালক সেই উদ্যান-হর্ম্যতলস্থ একটি মূল্যবান্ বস্তু নষ্ট করে। সেইসময়ে শশিপদ বাবু সমস্ত বালক-বালিকাকে এক বৃক্ষতলে ডাকিয়া লইয়া নীতিবিষয়ক উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলে একাগ্রচিত্তে স্থিরভাবে তাহা শুনিতে লাগিল। তাহাদের জননীরাও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষির সেইসকল কোমল নীতি-পূর্ণ হৃদয়স্পর্শী উপদেশ শুনিয়া তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

বালক-বালিকাদিগের প্রতি ব্রহ্মর্ষির এই আন্তরিক স্নেহ কেবলমাত্র গল্প ও উপদেশাদির দ্বারাই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাহাদের উন্নতির নিমিত্ত তিনি জীবনের অনেক সময় ব্যয়িত করিয়াছেন। তিনিই বরাহনগরে প্রথম বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কেবল হিন্দু বালকদের জন্য নহে, মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সেইসময়ে বরাহনগর-বাসী মুসলমানদিগের নৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সেই নিরক্ষর মুসলমানদিগের সন্তানগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া আত্মোন্নতি-সাধনে সমর্থ হইতে পারে, তজ্জন্য ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর স্থানীয় মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া তদ্বিষয়ক একটি প্রস্তাব করেন। এবং তদনুসারে নভেম্বর মাসের প্রথমেই মুসলমান বালকদিগের নিমিত্ত এক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রাহ্মসমাজে বালক-বালিকাদিগের জন্য যে তাহাদের উপযোগী স্বতন্ত্র সংগীতের প্রয়োজন, তাহা সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মর্ষিই অনুভব করিয়াছিলেন। এবং তিনি নিজেও ঐরূপ কয়েকটি গান রচনা করেন। উহা সেইসময়ের (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) 'তত্ত্ব-কৌমুদী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত সরল। ঠিক প্রাচীন কালের ছড়ার মতো অভ্যাস করিয়া বালক-বালিকারা আপন মনে সেই গান গাইত। তার মধ্যে একটি গান এই—

"মা, আমি ভালো মেয়ে হব গো তোমার,
তুমি যা বলিবে তাই করিব, করিব না হুঁ হাঁ।
আমি কি খাইব, কি পরিব সদা এই ভাবনা মা তোমার।
আমার অসুখ হ'লে, চোখের জলে মুখে বল দয়াময়।"

জন্মদিনে গাইবার জন্য ব্রহ্মর্ষির রচিত একটি গান "ব্রহ্মসঙ্গীত" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

আলাইয়া—যৎ

আজ মনের সাধে প্রাণভরে ডাক্‌বো দয়াময়।
যেন জনম দিনের ফল জীবনেতে রয়।
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কানে শুনি,
মন্দ বালক যথা (আমি) যাব না তথায়।
পিতামাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
তাঁহাদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।
তুমি ভালোবাসো বলে, ভালোবাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালোবাসিতে তোমায়॥

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে-সময়ে শ্রমজীবিগণের জন্য "ভারত-শ্রমজীবী" নামক একখানি পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করায় সে-ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তবে স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন মহাশয় যে-সময়ে বালক-বালিকাদের জন্য 'সখা' নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, ব্রহ্মর্ষি তাহাতে বিশেষ সহানুভূতি ও সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রমদা বাবুকে সর্ব্বদা সে-বিষয়ে সৎপরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করিতেন।

ব্রহ্মর্ষির দৈনিক বিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বালক-বালিকা-দিগের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তাঁহার স্বাভাবিক একটি বিশেষ গুণ। তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার হৃদয় যথার্থই কাঁদে। তিনি যখন যেখানে থাকেন, বালক-বালিকাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-চিন্তা তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। ব্রহ্মর্ষির দৈনিক বিবরণীর কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"আমি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রাহ্ম-পাব্লিক-ওপি-নিয়ন্ (Brahmo Public Opinion) সংবাদ পত্রের উন্নতির নিমিত্ত নূতন গ্রাহক সংগ্রহ এবং অঙ্গীকৃত অর্থ আদায় প্রভৃতি কার্য্যের জন্য গোয়ালন্দ হইতে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া ঢাকা নগরীতে যাইতেছি। প্রাতঃকাল কি মধুময় ও প্রফুল্লতাজনক! সেইসময়ে বালক-বালিকা-দিগের জন্য একটি লাইব্রেরী সংস্থাপনের ভাব আমার মনে উদিত হইল। চিন্তা করিয়া দেখিলাম এই ভাবটি সুন্দর, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা কার্য্যে পরিণত করিব? ভগবান্ কৃপা করিয়া সন্তানদিগের উন্নতির জন্য হৃদয়বান্ মনুষ্য প্রেরণ করুন। যখন আমি বাহিরে ভ্রমণ করিব, তখন আমি কি-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি? সামাজিক উপাসনা ভালরূপ করা, বা প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার শক্তি আমার নাই। যেখানে যাই, সেখানে এরূপ লোক অনেক আছেন যাঁহাদের চরণতলে বসিয়া আমি অনেক শিক্ষা করিতে পারি, তবে আমি কি করিব? কিন্তু আমাকে কিছু করিতেই হইবে। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বসিয়া আলাপাদি করা পূর্ব্ব হইতেই আমার ইচ্ছা; কিন্তু আমার মনে হইতেছে, কলিকাতায় যেরূপ ব্রাহ্ম বালক-বালিকাদিগকে একত্র করিয়া প্রার্থনা ও উপদেশাদি দান করিয়া থাকি, আমি যেখানে যাই সেখানেও সেইরূপ করিতে পারি। ভগবান্ আমাকে এই কার্য্যের উপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মর্ষির উপবীত ত্যাগের পরে বরাহনগরে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। পথে ঘাটে বাজারে, বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেই যখন ঐ কথা লইয়া বিষম গণ্ডগোল করিতে লাগিল, সেইসময়ে কলিকাতা হইতে কোনো কোনো ব্রাহ্মবন্ধু বরাহনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন। প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় সংবাদ পত্রে আন্দোলন দেখিয়া ব্রহ্মর্ষির সহিত দেখা করিতে আসেন; ব্রহ্মর্ষিও কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। দুই স্থানে দুই ভাবের প্রাদুর্ভাব—কলিকাতায় ধর্ম্মমত প্রচার ও বহিরনুষ্ঠানের চেষ্টা, বরাহনগরে সৎকার্য্যানুষ্ঠানের প্রবলতা। সেখানে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ঈশ্বরকে জীবনের মধ্যবিন্দু করিয়া নানাপ্রকার সৎকার্য্যের সূত্রপাত করেন এবং তাহাতে অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করেন। তাঁহারই চেষ্টায় বরাহনগরে সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী সভা, সাধারণ পুস্তকালয়, বালিকাবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, শ্রমজীবী সভা, সাধারণ সঞ্চয়-ভাণ্ডার প্রভৃতি নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উদ্যোগী হইয়া বরাহনগরে মিউনিসিপ্যালিটী আনয়ন করেন। তজ্জন্য তথাকার অনেকেই তাঁহাকে 'Father of the Municipality' বলিয়া থাকেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এ-দেশে যে অতি ভীষণ প্রলয়কারী মহা ঝটিকা হয়, তাহাতে অসংখ্য প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বহু লোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই গৃহের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। বিশেষ দরিদ্রদিগের দুরবস্থা দেখিয়া দয়ালু ব্যক্তিদিগের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। শশিপদ বাবু বরাহনগরের দরিদ্রদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্টের এবং ধনীদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন বরাহনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভীষণ কলেরা

রোগে মহামারী উপস্থিত হয়, সে-সময়ে শশিপদ বাবু ঐ সংবাদ গভর্ণ-মেণ্টকে জানাইয়া তথা হইতে ঔষধাদি আনয়ন করত দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন*। উক্ত মহামারী প্রায় সাড়ে তিন মাস যাবত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ব্রহ্মর্ষি একদিনও সুস্থির হইতে পারেন নাই। প্রতিদিনই বহুসংখ্যক লোক তাঁহার বাটীতে ঔষধাদির জন্য আসিত; তিনি বাটীতে না থাকিলে, তাঁহার স্ত্রী ঔষধ দিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ে ব্রহ্মর্ষি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদিগকে প্রতিদিন অন্ন দান করিতেন। সে-সময়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু দ্বারে সমাগত ক্ষুধার্ত্ত-দিগকে অন্ন না দিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। কোনো কোনো দিন নিজ আহার্য্য অন্ন দিয়া সমাগত অনাহার-ক্লিষ্ট লোকের ক্ষুধাশান্তি করিতেন। এইরূপে প্রতিজনের জন্য তিনি বহুল পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়া যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করেন। সে সময়ে কলিকাতাস্থ কোনো কোনো ব্রাহ্মের এইসকল সৎকার্য্যে তাদৃশ সহানুভূতি ছিল না; এমন কি, কেহ কেহ গোপনে গোপনে এই সকল সৎকার্য্যের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবও প্রকাশ করিতেন। একদা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বরাহনগরে শশিপদ বাবুর বাটীতে (শশিপদ বাবু তখন চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে থাকিতেন) আসেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মর্ষির সহিত তর্ক-বিতর্ক করেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—'এখনো এ-দেশে এরূপ সৎকার্য্যের সময় আসে নাই। এখন কেবল পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ধ্বংসের চেষ্টা করাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য।' ব্রহ্মর্ষি অন্যান্য সৎকার্য্যেরও আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ের বাদানুবাদ চলিল। কেহই কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতে (রবিবারে) প্রচারক মহাশয় বেদী হইতেই ব্রহ্মর্ষি শশিপদর মতকে

আক্রমণ করেন। তৎপরে অন্য একদিন ব্রহ্মর্ষি বেদী হইতে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সেই উপদেশের সার মর্ম্ম এই,—

"ধর্ম্মে জ্ঞান ও কর্ম্ম এ-দুয়ের মিলন চাই। একের অভাবে অন্যটি তিষ্ঠিতে পারে না। সৎকার্য্যের প্রতি অনুরাগ না হইলে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারে পরিণত হয়। চৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব এ-দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভিতরে তাদৃশ জ্ঞানচর্চ্চা ও বিশুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না থাকাতে তাঁহার পরলোক গমনের পরে নানাপ্রকার কুসংস্কার ও ক্ষুদ্রতা আসিয়া পড়ায় বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভিতরে নূতন ভাব আসিয়াছে—চরিত্রের বিশুদ্ধতা এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহাদের এই চেষ্টা ফলবতী হউক।" ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সৎকার্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে ইহা ব্রহ্মর্ষি শশিপদর প্রাণের একান্ত ইচ্ছা। সংস্কার-মূলক বিবিধ সৎকার্য্যকে তিনি ধর্ম্মের প্রধান বহিরঙ্গ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম কেবল বাহিরের নহে, তাঁহার নিজের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি আছে। নিজের ত্রুটি নিজের অপরাধ তিনি কখনই ক্ষমা করেন না। অপরে তাঁহার দোষ দেখিতে না পাইলেও তিনি নিজে তাহা দেখিতে পান এবং নিজের দোষের জন্য অনুতপ্তচিত্তে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রার্থনা করেন এবং যতক্ষণ সে-দোষের সংশোধন না হয় ততক্ষণ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা পাইতে থাকেন। তিনি যে যথার্থই ক্লেশানুভব করেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বনহুগলী-নিবাসী বাবু রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট কিছু টাকা পাইতেন। টাকা চাহিলেই রামতারণ বাবু 'আজ-কাল' করিয়া কেবলই ঘুরাইতেন। এইরূপে অনেকদিন চলিয়া গেল, তিনি ব্রহ্মর্ষিকে একটি পয়সাও দিলেন না। একদিন

ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া রামতারণ বাবুর নিকট পাওনা টাকা চাহিতে গেলেন এবং নিজের একান্ত অভাব জানাইয়া 'আজ কিছু না দিলেই নয়' বলিলেন; কিন্তু সে-দিনও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "কিছুই দিতে পারিব না" বলিলেন। এই উত্তর পাইয়া ব্রহ্মর্ষি তাঁহার প্রতি কিছু কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরদিন রবিবার প্রাতঃকালে সামাজিক উপাসনার জন্য যখন ব্রহ্মর্ষি বেদীতে আসন গ্রহণ করেন, তখন নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্রই পূর্ব্বদিনের সেই কর্কশ ভাষা ব্যবহারের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাহাতে তিনি এতই ব্যথিত হইলেন যে, যখন উপাসনার প্রথম সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে, তখন উন্মাদের ন্যায় সমাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দ্রুত গমন করেন। তাঁহার প্রাণে তখন এই ভাবের আতিশয্য হইয়াছিল যে, "রামতারণ বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া কিরূপে ঈশ্বরের পূজা করিব এবং কিরূপেই বা ভগবানের দর্শনলাভ করিব। রামতারণ বাবু তখন বাটীতে না থাকায় তাঁহার সহিত ব্রহ্মর্ষির দেখা হইল না। তখন সেইস্থানেই নিজের ত্রুটির জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মর্ষি সমাজ-মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপ অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে মানুষ কখনই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মর্ষি নিজের ত্রুটি দেখিবার জন্য এতই উৎসুক যে, যখন কোনো ব্যক্তি কার্য্যোপলক্ষ্যে তাঁহার বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার নিজের দোষ ত্রুটির কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। তাঁহার অমায়িকতার জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে শশিপদ বাবু "সাধারণ ধর্ম্মসভা" নামে একটি নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। সে-সভাতে সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব-

সমূহ আলোচিত হইত। যাহাতে সকলেই ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া একতাসূত্রে মিলিত হইতে পারেন, তাহাই ছিল উক্ত সভার উদ্দেশ্য। সেই সভার দ্বারা ব্রহ্মর্ষির উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষির এই 'সাধারণ ধর্ম্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে ঐরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বেড্‌ফোর্ড অ্যাভিনিউ নামক উপাসনালয়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেষ্টারা উপদেশ দিতেন। এই বিবরণ লিখিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নিউইয়র্কের লিবারল্ পত্রিকা পৃথিবীর উন্নতির দিকে গতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এমন দিন আসিবে যখন সিংহ এবং মেষ একস্থানে শয়ন করিবে, কিন্তু ঐ মেষ ঐ সিংহের উদরস্থ হইবে না।" লিবারল্ পত্রিকার ঐ ভবিষ্যদ্দর্শনের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ধর্ম্মের নামে এই পৃথিবীতে কত ভীষণ লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়াছে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের রক্তে নিজ বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন। এখন আর সে-দিন নাই বলিয়াই ব্রহ্মর্ষি এই 'সাধারণ ধর্ম্মসভা' প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদই এই উদার সার্ব্বজনীন সাধারণ সম্মিলন-ধর্ম্মসভার প্রথম সংস্থাপক। তিনিই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদি গুরু। উক্ত সাধারণ ধর্ম্মসভার পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 'নববিধান ধর্ম্ম' প্রচার করেন। কিন্তু তাহাতে সাধারণ ধর্ম্মসভার মতের ন্যায় সম্পূর্ণ উদার ভাব প্রচারিত হয় নাই। কেশব বাবু সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে একত্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মাবলম্বী ধার্ম্মিকগণকে গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত লইয়া ব্রাহ্মদিগের পরস্পরে অমিল ও অসদ্ভাবের সূত্রপাত হয়, সেই মতভেদ দূর করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষির প্রাণে প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সেই ইচ্ছা ১৮৭৪

খৃষ্টাব্দে 'বরাহনগর সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতার কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া 'ব্রাহ্ম-সম্মিলন' নামে যে সভা করেন, ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ বাবু নবীনচন্দ্র রায় উক্ত সভার সম্পাদক হইয়াছিলেন। সকলের চিন্তা এবং কার্য্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের ভিতরে একতা ও সদ্ভাব বিস্তার করাই ঐ সভার উদ্দেশ্য। ঐ সভা হইতে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের আনন্দ-সম্মিলনাদি হইত। তাহাতে সকলে পরস্পরের সহিত দেখা-শুনা আলাপ-পরিচয়াদি করিতেন। এই সভার উদ্যোগে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে "সমদর্শী" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা বাহির হইতে লাগিল। পরলোকগত ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যে মতভেদ আরম্ভ হইয়াছিল, 'সমদর্শী'তে সেইসকল মত আলোচিত হইত।

মানুষের অন্তরের ধর্ম্মভাব সকলসময়ে বাহিরের কার্য্যদ্বারা ঠিক্ করা যায় না। ধর্ম্মভাবের অভাব বাহিরের কার্য্যে শীঘ্রই প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সকলের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান বাহিরের কার্য্যে অনেক সময়ে ঠিক্ বুঝা যায় না। মানুষ অনেক সময় ধর্ম্মের বাহ্যাবরণ পরিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কাহার ভিতরে কি আছে তাহা সকলে জানিতে পারে না। তবে প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট কাহারো ধর্ম্মভাব বেশি দিন অপ্রকাশিত থাকে না। ব্রহ্মর্ষির এই আন্তরিক ধর্ম্মভাব সামান্য সামান্য কথায় এবং আড়ম্বরশূন্য আচরণে কেমন প্রকাশ পাইয়া থাকে, নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহার একটি প্রমাণ ;—তিনি তাঁহার বালিকাবিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর মধ্যে একটি নিয়ম এই করিয়াছিলেন

যে, প্রতিদিন ইস্কুল বসিবার পূর্ব্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইস্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই প্রার্থনার ভার তিনি হেড্-মাষ্টারের উপর দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে হেড্মাষ্টার ছাত্রীদিগকে লইয়া প্রত্যহ প্রার্থনাপূর্ব্বক ইস্কুলের কার্য্য আরম্ভ করিতেন। কিছুদিন পরে হেড্মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলেন। শশিপদ বাবু তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলে তো আর কিছুই থাকে না। আমি পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে পারি, কিন্তু প্রার্থনাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তুমি প্রার্থনাকে ধরিয়া থাক, দেখিবে ঐ লুপ্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ধীরে ধীরে সমুদ্রতল হইতে উত্থিত হইয়া তোমার মানস-সমুদ্রের কূলে আসিয়া লাগিয়াছে। আর যদি প্রার্থনাকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আয়ত্ত কর, দেখিবে অল্প-দিনের মধ্যেই ঐ-সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের জীবন অন্তর্হিত হইয়াছে; মৃতদেহরূপ পুস্তকের পত্রগুলি কেবল তোমার নিকটে পড়িয়া আছে।" ঐ এক দিনের একটি কথাতে শশিপদ বাবুর প্রার্থনার উপরে কেমন দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মর্ষির দৈনিক প্রার্থনা অতি অল্প ও সহজ কথাতেই পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু সেই কথাগুলি এমন সরস ও মর্ম্মস্পর্শী যে, যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ আর্দ্র ও সরস হইয়া যায়। অনেকের বড় বড় কথাতে সেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না। একদা কর্ম্মোপলক্ষ্যে তিনি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেইসময়ে কৃষ্ণনগর-নিবাসী সাধু ভক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই প্রাতঃকালে তাঁহার বাসায় আসিতেন। শশিপদ বাবু নগরের প্রান্তে নদী-তীরে বাস করিতেন, এজন্য রামতনু বাবু সেই স্থানটি

স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো দেখিয়া প্রায়ই সেখানে আসিতেন এবং সমস্ত দিন ব্রহ্মর্ষির পরিবারের সঙ্গে থাকিতেন; সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসিতেন। প্রাতে যখন তিনি আসিতেন সেইসময়ে ব্রহ্মর্ষিও পারিবারিক উপাসনায় বসিতেন। লাহিড়ী মহাশয় আসিয়া ঐ উপাসনায় যোগ দিতেন। ব্রহ্মর্ষির সরস সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা-বাক্যগুলি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইতেন এবং বলিতেন, "এই ছোট ছোট কথাগুলি আমার প্রাণে বড়ই ভালো লাগে।" তিনি যেদিন আসিতেন সেদিন ব্রহ্মর্ষির বাসাতেই থাকিতেন। এইরূপে ব্রহ্মর্ষির পরিবারে সম্মিলিত হইয়া রামতনু বাবু সপরিবারে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যেই উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রার্থনাতেই মানুষের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। প্রার্থনাই মানুষকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখিতে পারে। যিনি ভগবানের দয়া ও প্রেমে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে সরস মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা উত্থিত হয়। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে জাগরণে সে-প্রার্থনার বিরাম হয় না। যখন তাহা মুখের কথায় প্রকাশ পায়, তখন যাহাদের কর্ণ আছে তাহারা তাহা শুনিতে পায়, যাহাদের হৃদয় আছে তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। ব্রহ্মর্ষি শশিপদর প্রার্থনা অন্নপানাদি শারীরিক ক্রিয়ার ন্যায় এরূপ নিত্য সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বপ্নে বা রোগের প্রলাপেও তাঁহার মুখ হইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনাসূচক বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। রোগের প্রলাপে, আকস্মিক উন্মত্ততায়, কিম্বা স্বপ্নের ভাষায় মানুষের মুখ হইতে যে-সকল কথা উচ্চারিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই তাহার অন্তরের কথা। যে যে বিষয়ের চিন্তা করে, যে-বিষয় যত্নের সহিত সে হৃদয়ে ধারণ

করে, ঐ সকল অবস্থায় সেই বিষয়ের কথাই তাহার মুখ হইতে বহির্গত হয়। ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী প্রভৃতি আত্মীয় পরিবারেরা অনেক দিন তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় প্রার্থনার কথা শুনিয়াছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত খাঁটি ধর্মভাব এইসকল বিষয়ের দ্বারাই প্রকাশ পায়।

সুরাপান নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠার পর একদিন ব্রহ্মর্ষি প্রার্থনা করিয়া সেই সভার কার্য্য আরম্ভ করেন, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কে তাঁহাকে সেদিন প্রার্থনা করিতে বলিল? সেই ভাব কে তাঁহার প্রাণে প্রেরণ করিল? ব্রাহ্মসমাজের বিষয় তখন তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না। ব্রাহ্মদিগের সহিত তখন পর্য্যন্ত তাঁহার আলাপ পরিচয়ও হয় নাই। ইহার মধ্যে আমরা ভগবানেরই হাত দেখিতে পাই। তিনিই তাঁহাকে প্রার্থনা ধরাইলেন এবং প্রার্থনা দ্বারাই তিনি তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে দেশে ধর্ম্মসংস্কারের জন্য এবং পৌত্তলিকতা ও ভ্রম কুসংস্কারের হাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবান, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে প্রস্তুত করিতেছিলেন; তাই তিনিও তাঁহার গুড্ উইল্ ফ্রেটার্নিটিতে একদিন হঠাৎ প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই পরমেশ্বরই স্বয়ং বরাহনগরে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষিকে প্রথমে এই প্রার্থনামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাই ব্রহ্মর্ষির মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রার্থনাই তাঁহাকে সমস্ত সাধুকার্য্যে লইয়া গিয়াছে। প্রার্থনাই তাঁহাকে সকল বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছে।

বাড়িতে পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে ব্রহ্মর্ষি ভগবানের স্তব স্তুতি ও প্রার্থনাকে বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের কোনো পীড়ায় চিকিৎসকের আবশ্যক হয় না। তিনি নিজেই

নিজের চিকিৎসা করেন। স্ত্রীপুত্র কন্যাদিগের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তিনি চিকিৎসক আনিতেন, কিন্তু প্রার্থনাই তাঁহার প্রধান আশার স্থল ছিল। কাহারো কঠিন পীড়ার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ব্রহ্মর্ষির বাড়িতে ভগবানের স্তব প্রার্থনা ও নামসঙ্কীর্তন আরম্ভ হয়। পূর্বকালে এ-দেশের প্রায় সর্বত্রই দেখা যাইত, কোনো বাড়িতে কাহারো কঠিন পীড়া হইলে ভগবানের আরাধনা, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি শান্তিস্বস্ত্যয়ন হইত। নারায়ণে তুলসীদান, শিবপূজা ও চণ্ডীপাঠ এই ত্রিবিধ স্বস্ত্যয়ন এ-দেশের হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। কোনো কোনো স্থানে সায়ংকালে হরিসঙ্কীর্তন হইয়া থাকে। ব্রহ্মর্ষি বলেন, তখন রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকিলে স্বস্ত্যয়নেরও বৃদ্ধি হইত। একজন কবিরাজের হাতে রোগীর চিকিৎসার ভার দিয়া সে-কালের লোকেরা শান্তিদাতা ভয়ত্রাতা ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। রোগ যত বাড়িত, তাঁহারা তত বলিতেন, "ডাকো তাঁরে, ডাকো তাঁরে, যিনি বিপদভয় ভঞ্জন করেন, মনপ্রাণ সঁপিয়ে সেই জগদীশ্বরকে ডাকো।" এখন আর সেদিন নাই, সে-ভগবদ্বিশ্বাসও নাই, সঙ্কট পীড়ার সময়ে আর সে-স্তুতিপাঠ শুনা যায় না। এখন "ডাকো তাঁরে" এই কথার পরিবর্তে হইয়াছে 'ডাক্-তারে' 'ডাক্-তারে'—ডাক্তারের ডাক বাড়িয়াছে। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ নিজের কোনো পীড়ার সময়ে সেই প্রাচীন প্রথাই বজায় রাখিয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে ডাকেন না, যিনি ভবরোগের ধন্বন্তরী, যাঁহাকে ডাকিলে যমের ভীষণ গর্জন আর শুনিতে হয় না, সেই নিখিল বিশ্বের বড় ডাক্তার যিনি, সেই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্‌কে ডাকিয়া থাকেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে বার্দ্ধক্যের দুর্বলতায় ব্রহ্মর্ষির স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কয়েক মাস ধরিয়া তিনি বিবিধ অসুখে ভুগিতে থাকেন। ডাক্তার কবিরাজ নাই, তাহা পূর্বেই

বলা হইয়াছে। প্রার্থনাই তাঁহার ঔষধ, তাহাতেই তিনি নিরাময় হইয়া থাকেন। সেবারে রোগ উপশমিত হইলে আগষ্ট মাসের শেষে তিনি প্রাচীন প্রথা ধরিয়া নিজগৃহে অষ্টাহ যাহাতে আচার্য্যের দ্বারা ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা এবং নামসঙ্কীর্ত্তনাদি হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে ৩০শে আগষ্ট বুধবার হইতে পর সপ্তাহের বুধবার পর্য্যন্ত এই আট দিন অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে এক এক জন আচার্য্য কর্ত্তৃক মঙ্গল প্রার্থনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন প্রথানুসারে ব্রহ্মর্ষি এই অষ্টাহ মঙ্গলানুষ্ঠানের নাম "অষ্টমঙ্গলা" রাখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ১৩১৮ সালের ১৬ই কার্ত্তিক (১৯১১ খৃঃ—২রা নভেম্বর) তারিখের "তত্ত্ব-কৌমুদী" পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এ স্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"গৃহে সমবেত উপাসনা—আমাদের প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি রুগ্ন অবস্থায় বাস করিতেছেন। এ সময় তিনি বন্ধুগণের মুখে পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ উপাসনার আয়োজন করেন। বিগত ৩০শে আগষ্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহার বাসস্থানে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কুলভি, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; অনেক পুরুষ ও মহিলাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। শেষদিন কেবল যুবকবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন উপাসনান্তে জলযোগ হইত।"

দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের জন্য আত্মীয়সভা ব্রাহ্মসমাজে অনেক দরিদ্র লোক আছেন, তাঁহারা সামাজিক সহানুভূতি অভাবে

অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করেন। সামাজিকতা বা সামাজিক আত্মীয়তা পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর এ-দেশে নাই, সকলে আপনার লইয়াই ব্যস্ত। বিশেষ দরিদ্রদিগের দুঃখে সকলের দুঃখ হয় না, এজন্য ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা দীন দুঃখী আছেন, তাঁহাদিগকে অনেকেই ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সম্পদে উৎসবে অনেকেই তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণও করেন না। দুটি মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার লোকও অতি কম। দুঃখীর দুঃখের কথা বড় কেহই শুনিতে চায় না। একদিন কয়েকটি গরীব ব্রাহ্ম ব্রহ্মর্ষির নিকটে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের দুঃখের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সেইদিন হইতেই তিনি তাঁহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিরদিনই অনাথ দুঃখীদিগের দুঃখে ব্যথিত হন। এবং চিরদিনই নিঃসহায় নিঃসম্বল অনাথদিগের দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া আসিতেছেন। তিনি স্থানীয় দরিদ্র শ্রমজীবিদিগের বন্ধু। এদেশের বিধবারা বড় দুঃখী, তাই তাঁহাদিগের জন্য নিজের বাড়িতে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেবাব্রত শশিপদ দুঃখী দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য ১৮৯৭ সালের ১১ই জুন রবিবার কলিকাতায় অনেকগুলি দরিদ্র ব্রাহ্মকে তাঁহার বরাহনগরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং সেইদিন অপরাহ্নে নানাকথার পর ব্রহ্মর্ষি "আত্মীয়সভা" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহাতে দুঃখী ব্রাহ্মদিগের এবং দরিদ্র ব্রাহ্ম বালক-বালিকাগণের উন্নতি হয়, তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য। মাসে একবার করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ব্রহ্মর্ষি নিজে একশত টাকা দান করেন। তাঁহার এই বদান্যতা বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই অনুকরণীয়। যশের প্রার্থী না হইয়া অথবা নানারূপ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা

না রাখিয়া এরূপ নিঃস্বার্থ দান এখন অতি বিরল। কলিকাতায় 'কেশব একাডেমি' নামক ইস্কুল-বাড়িতে এই সভার কার্য্য হইত। ঐ ইস্কুলটি ব্রহ্মর্ষির জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্ত মহাশয়ের। ব্রহ্মর্ষির অনুরোধে ঐ বিদ্যালয়ে ১০টি ছাত্রকে 'ফ্রি' পড়াইবার ব্যবস্থা হয়। আত্মীয় সভা উঠিয়া গেলেও ঐ ইস্কুল হইতে 'ফ্রিশিপ' উঠিয়া যায় নাই।

আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা—ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ইংলণ্ড হইতে যে উৎসাহ ও কার্য্যকরী শক্তি লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই উৎসাহ ও সেই শক্তি কার্য্যে নিয়োজিত হইল। তিনি বরাহনগরে নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। সেইসকল কার্য্যের মধ্যে একটি কাজ বরাহনগরের যুবকদিগকে সৎকার্য্যে আকৃষ্ট করা। কালীকৃষ্ণ দত্ত, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিনারায়ণ দাঁ, প্রভাতচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র দে এবং শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দক্ষিণ বরাহনগরের কয়েকটি যুবক ব্রহ্মর্ষির প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইল। উক্ত যুবকেরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উৎসাহের সহিত সভাসমিতি প্রভৃতি করিয়া নীতি প্রচারে উৎসাহিত হইল। ব্রহ্মর্ষি তাহাদের সহায় হইলেন। ইহাদিগকে লইয়া তিনি বর্দ্ধিত উৎসাহে বর্দ্ধিত বলে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণ বরাহনগরে যেন একটা জাগ্রত ভাব—মুখরিত ভাব দেখা দিল। সমগ্র বরাহনগরে কার্য্যের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। উৎসাহের একটা জলন্ত শিখা বিস্ফুরিত হইল। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই প্রাচীন মন্ত্র আবার সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। ঐ সকল যুবক বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিল। তখন বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে হইত। মুন্সি বাবুদের পুরাতন বাটীতে তাহাদের বৈঠক হইত। ব্রহ্মর্ষি নিয়মমত তথায় যাইতেন। ঐস্থানে ১৮৭৫।৭৬ সালে 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইল। উক্ত সভা কেবল যুবকদিগের জন্য

উহার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানবিস্তার, সমাজসংস্কার এবং আত্মোন্নতি প্রভৃতি। ঐ সভা হইতে একটি লাইব্রেরী এবং বালিকাদিগের জন্য একটি রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। পরে ঐ-অঞ্চলে একটি নৈশ বিদ্যালয় হইয়াছিল। সময়ে-সময়ে উক্ত নীতি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়িতে যাওয়া হইত। সেখানে কালীকৃষ্ণ দত্ত, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বালকদিগকে গল্পচ্ছলে নানাবিধ উপদেশাদি দিতেন। ব্রহ্মর্ষি সকলকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইতেন। এই আত্মোন্নতি-বিধায়িনী সভার বাৎসরিক অধিবেশন প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমীর ছুটির সময়ে বরাহনগরে প্রেমচাঁদ মল্লিকের গঙ্গাতীরস্থ বাগান-বাটীতে হইত। কলিকাতা হইতে স্বর্গীয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সুবক্তা ঐ-সময় উপস্থিত হইতেন। উক্ত লাইব্রেরীতে ব্রহ্মর্ষি অনেক পুস্তক ও ছবি দিয়াছিলেন। ১৮৮৯ সালে মিস্ ই, এ, ম্যানিং যখন বরাহনগরে আসিয়াছিলেন, তখন এই "আত্মোন্নতি-বিধায়িনী" সভা হইতে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দাশরথী সান্ন্যাল মহাশয় ঐ-সভার একজন সভ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই। এখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন সুবিখ্যাত উকীল। উক্ত সভার যুবক সভ্যগণ যখন বাহিরের নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন সেইসময়ে ব্রহ্মর্ষি উক্ত সভার এক অধিবেশনে যুবকদিগকে নিজ নিজ গৃহের উন্নতিসাধন-কল্পে একটি সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই,—"যাঁহারা যথার্থ আত্মোন্নতি ও দেশের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ উন্নতিবিধানের সহিত যাহাতে গৃহিণীদিগেরও উন্নতি হয় তাহা করিতে হইবে। উন্নত সহধর্ম্মিণী না হইলে পুরুষের উন্নতি স্থায়ী হয় না। অতএব সকলে

উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা গৃহিণীদিগকে উন্নত করিবে। তাহা না হইলে নিজেরাও ক্রমশ অবনতির দিকে যাইবে, আর আত্মোন্নতি তো হইবেই না, দেশের কাজও কিছু হইবে না।”

বরাহনগরের যুবকগণ খুব উৎসাহের সহিতই কাজ করিতে লাগিল। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক উক্ত সভার জনৈক সভ্য চাকরি লইয়া এলাহাবাদে চলিয়া যান, সেখানে গিয়াও তিনি খুব উৎসাহের সহিত বালিকাবিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, লাইব্রেরীস্থাপন প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং জনহিতকর বিবিধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ ‘আত্মোন্নতি-বিধায়িনী’ সভার অনেক কার্য্য করিয়াছেন; বরাহনগর তাহা কখনই ভুলিতে পারিবে না। তিনি উত্তর বরাহনগরস্থ শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হল, ব্রাহ্মসমাজ এবং শ্রমজীবিদিগের কার্য্যে ব্রহ্মর্ষির অনেক সাহায্য করিয়াছেন। লিখিতে পড়িতে গাইতে বাজাইতে সকল বিষয়েই তিনি একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-পুস্তকে উদ্ধৃত আছে। নানাপ্রকার ঘটনাস্রোতে ঐ যুবকদল পরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বিশেষত কালীকৃষ্ণ এবং ভবনাথ প্রভৃতি কয়েকটি উৎসাহী যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় বরাহনগরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মুন্সি বাবুদের পুরাতন বাটীর যে-অংশে ‘আত্মোন্নতি বিধায়িনী’ সভার লাইব্রেরী স্থাপিত ছিল, সেই অংশ নষ্ট হইলে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কুটিঘাটস্থ আস্তাবল-বাটীর উপরের একটি ঘরে উহা স্থান পাইয়াছে। সেই লাইব্রেরী এখন ‘পিপ্‌লস্ লাইব্রেরী’ নামে পরিচিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে ব্রহ্মর্ষি তাঁহার দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ কোনোরূপ সহানুভূতি পান

নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত মিশিতে কখনই দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি তাঁহার ধর্ম্মজীবনগঠনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা তিনি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন। এমন-কি যখন কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্য ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ব্রহ্মর্ষি নিজেও সেই প্রতিবাদ-কারীদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন, তখনো যুবকদিগের নিকট হইতে কেশব বাবুর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কিছু শুনিতে পাইলেই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। সত্যের নিমিত্ত প্রতিবাদ করা এবং সদ্‌গুণের নিমিত্ত শ্রদ্ধাকে হৃদয়ে রক্ষা করা এ-দুইটি বড়ই কঠিন, অথচ এ দুইটিকেই রক্ষা করিতে হইবে। যখন কেহ কেশব বাবুর ত্রুটীর প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁহার অসংখ্য গুণরাশি বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে অযথা আক্রমণ করিতেন, তখন ব্রহ্মর্ষি হৃদয়ে আঘাত পাইতেন এবং উহার প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত হইতেন। তিনি বলিতেন, "কেশব বাবুর ন্যায় উন্নত তেজস্বী সদ্‌গুণসম্পন্ন দেশহিতৈষী, আমাদের মহোপকারী ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে আর কে আছে? রাজা রামমোহন রায়ের পরে অমন সৎসাহসী মহাপুরুষ আর কে জন্মিয়াছেন? আমরা যদি কেশব বাবুর একটি কি দুইটি ত্রুটী দেখিয়া তাঁহার অশেষ গুণসকল বিস্মৃত হই, এবং তাঁহার প্রদত্ত অমূল্য রত্নের অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা নিজেদেরি মূর্খতা ও কৃতঘ্নতার পরিচয় দিব, এবং নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারিব। যে-জাতি গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করে না, অপূর্ণ মানবের ত্রুটী দেখিয়া কৃতঘ্নতা অবলম্বন করে, সে-জাতি কখনই জাতীয় জীবনগঠন করিতে সমর্থ হয় না; বরং দিন-দিন জীবন হারাইয়া উৎসন্ন যাইতে থাকে। সত্যের প্রতি সমাদর, সত্য

প্রকাশকের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।"

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ যেমন কোনো ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হন নাই, সেইরূপ তিনি কখনো কোনো সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাবকে মনে স্থান দেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার ভাব দেখিলেই তিনি প্রাণে বড় ক্লেশ পাইতেন। কেশব বাবু যখন স্বদলের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া যান, তখন ব্রহ্মর্ষির সহানুভূতি এবং যোগ কেশব বাবুর দলের সহিতই ছিল, কিন্তু তখন আদি সমাজ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ হইত, তাহার জন্য তিনি অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেন। সেইসময়ে একদিন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে মহর্ষির বিরুদ্ধে একটি তীব্র লেখা দেখিয়া তিনি কেশব বাবুকে তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন। তাহাতে কেশব বাবু এই উত্তর করেন যে, "ডাক্তারেরা প্রথমে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষতস্থানের গলিত চর্ম্ম কাটিয়া ক্ষতকে ভালো করিয়া বাহির করেন, পরে ঔষধ দেন; আদি সমাজেরও সেইরূপ অগ্রে গলদ বাহির করিয়া দিতে হইবে।" এই কথা ব্রহ্মর্ষির ভালো লাগে নাই। তিনি মহর্ষি এবং ব্রহ্মানন্দের দলের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য অনেক সময়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন এই দুই দলে ঘোরতর বিসম্বাদ চলিতেছিল, তখন তিনি বিবাদের কোনো পক্ষে ছিলেন না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবে ব্রহ্মর্ষি চেষ্টা করিয়া মহর্ষি এবং ব্রহ্মানন্দকে এক বেদীতে বসাইয়াছিলেন। সকলেই জানেন যে, যজ্ঞোপবীত লইয়া প্রথমে উভয় পক্ষে বিবাদের সূত্রপাত হয়, অর্থাৎ উপবীতধারী আচার্য্য আদি সমাজের বেদীতে বসিতেন, কেশব বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাহাতে আপত্তি করেন। সেই আপত্তি হইতেই দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। তার পর বৎসর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবের দিন ব্রহ্মর্ষি বহু কষ্টে সেই পরস্পর-মতবিরোধী ব্যক্তিগণকে এক বেদীতে বসাইয়াছিলেন। আদি সমাজের উপাচার্য্য উপবীতধারী বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিকে আসন গ্রহণ করিলেন, অপর পার্শ্বে কেশব বাবু বসিলেন! কি অভাবনীয় সুন্দর দৃশ্য! এক আকাশে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সমুদিত। ধন্য ব্রহ্মর্ষি শশিপদ যিনি এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন! এই কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মর্ষি অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি পূর্ব্বোক্ত দলাদলির মধ্যে ছিলেন না। তিনি নিজে উপবীত-ত্যাগী হইয়াও উপবীতধারীর পক্ষে বেদীতে বসা যে একেবারে মারাত্মক দোষ, একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "হিন্দু হউন খৃষ্টান হউন বা মুসলমান হউন, যিনি সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, কাহারো প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ না করিয়া অকল্পিত ধর্ম্মোপদেশ দান করিবেন, তাঁহার নিকট হইতেই সে উপদেশ শুনা যাইতে পারে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মৃত সাধু মহাত্মাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য উক্তিসকল ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া পাঠ করা এবং তাহা শ্রবণ করা যদি দোষের বিষয় না হয়, তবে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী জীবিত কোনো ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিতে দেওয়া তিনি অন্যায় মনে করেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন অন্য ধর্ম্মের সত্যসকল বেদী হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এবং 'শ্লোকসংগ্রহ' নামক পুস্তক প্রকাশ করায় ব্রাহ্মসমাজকে এক উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী উপদেষ্টাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের বেদী দেওয়া আরো উদারতা এবং সত্যের প্রতি সমাদরের লক্ষণ।

হিত কথা ও ধর্ম্মোপদেশ সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেই সত্য এবং সদ্ভাব গ্রহণ করা উচিত। এই বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত হইয়া ব্রহ্মর্ষি শশিপদ পুরাণ কথকের কথকতা শুনিতে যাইতেন, খৃষ্টানদের চার্চ্চে পাদ্রির মুখে জীবন্ত বিশ্বাসের উপদেশসকল শুনিয়া নিজ বিশ্বাসকে সঞ্জীবিত করিতেন।

যে-সমাজ জ্ঞানে-ধর্ম্মে উন্নত, সে-সমাজে গুণিজনের সমাদর, সাধুদিগের সম্মান, গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির বিস্তৃতি দেখিয়া যেমন জ্ঞানোন্নতি বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ কোনো সমাজের ধর্ম্মোন্নতি বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই সমাজে সাধুদিগের প্রতি সম্মান, গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, বন্ধুজনে প্রীতি, কনিষ্ঠে স্নেহ, সুশীলে সৌহার্দ্দ এবং দীনজনে দয়া কতদূর আছে। এইসকল যে-সমাজে নাই সে-সমাজে প্রকৃত ধর্ম্ম নাই। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ইহা সম্যক্ বুঝিয়া এ-দেশে যাহাতে জ্ঞানোন্নতির সহিত ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তৃতি হয় তাহার জন্য বরাবরই নানারূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কিসে হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। অনেকে শুষ্ক হৃদয় লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচার সম্পন্ন হয় না। প্রথমে নিজের হৃদয়ের ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, নিজের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতিকে বিশ্বাসের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হয়, তবে তিনি অপরের ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মর্ষির সাধুজনে শ্রদ্ধা, গুরুজনে ভক্তি, দুঃখীজনে দয়া চিরদিনই সমান। সাধু সজ্জনের প্রতি কিরূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হয়, কিরূপে তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে

হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। উহার অভাবে যে আত্মার অবনতি এবং সমাজের অকল্যাণ হয় তাহা তিনি বুঝিতেন।

কোন্নগর-নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় একবার বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবে ব্রহ্মর্ষির বাড়িতে গিয়াছেন। কলিকাতা হইতে অনেক বন্ধু-বান্ধব সেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তথায় সমাগত হইয়াছেন। সেইসময়ে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ সেই বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত শিবচন্দ্র বাবুর যথোচিত সমাদর করিলেন, এবং তাঁহার যাইবার সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন; এমন সময়ে শিবচন্দ্র বাবু অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অত কেন, আমাকে এতদূর করচেন কেন?" ব্রহ্মর্ষি তখন রহস্য করিয়া উপস্থিত অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মদিগকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখুন, এখন আমরা যদি আপনার মতো বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করি, তবে আপনার মতো বয়সে আমাদিগকে আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠেরা সেরূপ করিবে কেন?"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসব-উপলক্ষ্যে ২২শে জানুয়ারি রবিবার (১০ই মাঘ) প্রাতঃকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছিলেন এবং আচার্য্যের কার্য্যের জন্য তাঁহাকেই বেদী দিলেন। সেদিন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম উপস্থিত। ব্রহ্মর্ষি শশিপদও গিয়াছিলেন। উপাসনান্তে মহর্ষি উপদেশের সময়ে কেশব বাবুর বিবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষকালে ব্রহ্মমন্দিরের খৃষ্টীয় ভাব অবলম্বন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদিগের খৃষ্টভক্তির উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতে "খৃষ্ট-বিভীষিকা" দর্শন করিয়া তাঁহার আতঙ্ক হইয়াছে ইত্যাদি বাক্যসকল যখন উচ্চৈঃ-

স্বরে বলিতে লাগিলেন, তখন কেশব বাবুর দলস্থ প্রায় সকল ব্রাহ্মই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া মহর্ষি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু চারিদিকে ব্রাহ্মগণ উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। তন্মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা মহর্ষিকে অবমানিত করেন। সেইসময়ে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক ধরিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। ইহারই নাম সাধুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা। সামান্য মতের একটু অমিল হইল বলিয়া কিংবা আমার মতবিরুদ্ধ কথা বলিলেন বলিয়া একজন সম্মানিত শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির বা গুরুজনের সম্মান নষ্ট করা অতি নীচতার কর্ম্ম। উপরোক্ত ঘটনার পর সেবাব্রত শশিপদর সহিত দেখা হইলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিতেন,—"শশি তুমিই সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিলে, তুমি না থাকলে আমাকে মেরেই ফেলত।" সেদিন সেই ব্রহ্মমন্দিরে সমাগত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মের মধ্যে একমাত্র শশিপদ বাবুরই অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। এই-রূপ মতের অমিলের জন্য তিনি কোনো গুরুজনের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করেন না। ব্রহ্মর্ষির সামাজিক অতি-বিরুদ্ধাচরণে গ্রামস্থ সকল লোক যখন তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময়েও গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা তাঁহার ভক্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ-প্রযুক্ত কোনোরূপ অসদ্‌ব্যবহার করিতেন না। গ্রামস্থ বৃদ্ধগণ সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি স্নেহযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান যুবকগণ যদি ব্রহ্মর্ষির ন্যায় সজ্জনে শ্রদ্ধা এবং গুরুজনে ভক্তি শিক্ষা করেন তাহা হইলে দেশের অনেক মঙ্গল হয়।

ব্রহ্মর্ষি বাল্যকাল হইতেই শান্তিসংস্থাপক। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যখনই কোনো বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে ব্রহ্মর্ষি তখনই সেই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত হইয়া ব্রাহ্মদিগের পরস্পরে অমিল ও

অসদ্ভাবের সূত্রপাত হয়, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মর্ষির প্রাণে প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। তাঁহার এই ইচ্ছা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 'বরাহনগর-সমাচার' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইসময়ে কলিকাতায় কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া 'ব্রাহ্ম-সম্মিলন' নামে যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। সকলের চিন্তা এবং কার্য্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের ভিতরে একতা এবং সদ্ভাব বিস্তার করা এই সভার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মর্ষি চিরদিনই ব্রাহ্ম-সম্মিলনের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে ঐ বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের নিকটে যে ব্রাহ্মপল্লী আছে, একদা তাহার প্রাচীর এবং রাস্তা লইয়া কোনো কোনো ব্রাহ্মের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ক্রমে কলিকাতা পুলিশকোর্টে মোকর্দ্দামা রুজু হয়। অনেক গণ্যমান্য ব্রাহ্ম সেই মোকর্দ্দামায় সাক্ষী হইয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ তাহার মধ্যে পড়িয়া বিবাদীদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া আদালত হইতে মোকর্দ্দামা উঠাইয়া দিলেন। পরলোকগত প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই মোকর্দ্দামায় একজন সাক্ষী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষিকে মাঝে মাঝে বলিতেন, "শশি বাবু, ভাগ্যে আপনি ছিলেন তাই আমরা এ যাত্রা নিস্কৃতি পেয়েছি।" ব্রাহ্মসমাজের তিনটি বিভাগের মধ্যে যাহাতে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়, তাহা ব্রহ্মর্ষির বহুদিনের প্রাণগত ইচ্ছা। পরলোকগত ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতির নিকট এইরূপ একটি ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সমিতির প্রস্তাব ব্রহ্মর্ষিই প্রথমে উত্থাপন করিয়াছিলেন। উহার কিছুদিন পরেই 'ব্রাহ্ম-সম্মিলন' সভা গঠিত হয়।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্য্যসমাজ একেশ্বরবাদ প্রচারের

জন্য কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে মতের অমিল থাকাতে তাঁহারা যে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারেন না এবং সুবিধা পাইলেই নিজ নিজ কাগজে পরস্পরকে তীব্র ভাষায় অযথা আক্রমণ করেন, ইহাতে ব্রহ্মর্ষি অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন লাহোর গিয়াছিলেন, তখন আর্য্যসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর্য্যসমাজের সভাপতি পণ্ডিত দুর্গা-প্রসাদও সে-বিষয়ে পোষকতা করিয়া ব্রহ্মর্ষিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আদি সমাজ হইতে আর্য্যসমাজের সহিত যখন সম্মিলনের চেষ্টা আরম্ভ হইল, তখন তিনি তাহাতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় কন্যা ঊষার বিবাহের পর যখন ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নব জামাতা নরসিংহকে বুধবারে আদি ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন সেই সম্মিলনের প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পৌত্র স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত সম্মিলনের সাধু ইচ্ছা এবং চেষ্টার সফলতার জন্য কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

জীবনীশক্তি জীবনের কার্য্য-প্রকাশক। একটি গাছ ঐ-জীবনী-শক্তির প্রভাবেই উর্দ্ধে বাড়িতে থাকে এবং চারিদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। ঐ শক্তি দেখা যায় না—কেবল বাহিরের কার্য্যের দ্বারাই উহা অনুমিত হয়। দেহের যেমন জীবনীশক্তি, আত্মারও সেইরূপ একটি জীবনীশক্তি আছে। সেই শক্তির প্রকাশে মানুষের জ্ঞান-প্রয়োজিত সৎকার্য্য বাহিরে প্রকাশ পায়। উহার নাম আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তি। ভগবান যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদেরই ঐ জীবনীশক্তি বা জীবন বর্দ্ধিত হয়। অন্নপানে যেমন শরীরের পুষ্টি হয়, ভগবানের

উপাসনায় তেমনি আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হয়। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ যে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে ঐ জীবনীশক্তি। ভগবানই তাঁহার লক্ষ্য, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই ভগবানের উপাসনা। ব্রহ্মর্ষি সেই প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ উপাসনা দ্বারা সর্ব্বদাই প্রাণপ্রদ শক্তি পাইয়াছেন।

অনেকে বলেন অমুক ব্রাহ্মসমাজের কাজে জীবন দিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি বলেন, "আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজে জীবন পাইতেছি। যত কাজ করিতেছি ততই জীবন পাইতেছি।" ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজের কাজই তাঁহার জীবনের কাজ। সকল সৎকার্য্যই ভগবানের কার্য্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই ভগবানের উপাসনা। মহর্ষির এই উপদেশ ব্রহ্মর্ষির জীবনে কেমন সুন্দররূপে কার্য্যকরী হইয়াছে।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বাল্যকালে ঠাকুর-খেলা করিতেন, অর্থাৎ অপর বালকদিগের সহিত মিলিয়া ঠাকুর-পূজা করা প্রভৃতি খেলা করিতেন। ক্রমশ বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বিহীন নীতি-প্রদর্শিত জীবন্ত ধর্ম্ম অগ্নির ন্যায় তাঁহার অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই প্রধূমিত হইতেছিল। সেই ধূমায়মান বহ্নি একদিন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই উক্ত ধর্ম্মভাব তাঁহার প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল, এবং তাহা তাঁহার পরিবারের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৮৬৫ সালের ৪ঠা জুন রবিবার ব্রহ্মর্ষি বরাহনগরের নিমচাঁদ মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে সামান্যভাবে যে 'বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের' প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন, চারি বৎসর তাহার কার্য্য এমন উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল যে, ১৮৬৯ সালের ১৯শে ফাল্গুন তাহার জন্য একটি সুন্দর প্রকাণ্ড উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উৎসাহ উদ্যম এবং ধর্ম্মভাব আরো বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ দক্ষিণ বরাহনগরে বাবু অঘোরনাথ গাঙ্গুলীর বাড়িতে একটি উপাসনা-সভা স্থাপিত করেন।

১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মর্ষি সস্ত্রীক ইংলণ্ডে যান। তথায় অবস্থানকালে তিনি নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিকট ব্রহ্মর্ষি বিশেষ আদৃত হইয়াছিলেন। এবং অনেক উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিবার জন্য তিনি সাদরে আহূত হইয়া অনেক উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ব্রহ্মর্ষি একদিন তথাকার বৃষ্টল নগরে একটি মাদক-নিবারিণী সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে ব্রহ্মর্ষি সেই সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার একজন প্রধান ধর্ম্মযাজক সেই সভার সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় তথাকার অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত। আমাদের পরিচিত একেশ্বরবাদী প্রোফেসর নিউম্যানও বক্তারূপে উপস্থিত। সেই সর্ব্বশ্রেণীর লোক-সমাকুল বিরাট সভা দেখিয়া ব্রহ্মর্ষি আহ্লাদয় মুগ্ধ হইলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সেই সভায় বক্তা ছিলেন। তন্মধ্যে এক খঞ্জ দর্জ্জি খুব তেজের সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদও সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সেই খোঁড়া দর্জ্জির বক্তৃতাই সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছিল। সেই সভায় ঐরূপ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ দর্শনে ব্রহ্মর্ষির অন্তরে দপ্ করিয়া, বিদ্যুতাগ্নির ন্যায় একটি ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি

ভাবিলেন, এদেশে যখন মাদক-নিবারিণী সভায় সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোক একত্র সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সুন্দররূপে কাজ করিতে পারিতেছে, তখন আমাদের দেশে ধর্ম্মসমাজে এইরূপ সকল শ্রেণীর লোকের একত্র সমাগম সম্ভবপর হইবে না কেন ? ঐ সভায় ঐ দৃশ্য দেখিয়াই ব্রহ্মর্ষির মনে তাঁহার "সাধারণ ধর্ম্মসভা" এবং "দেবালয়"এর আদর্শ অঙ্কুরিত হইল। সেখানে থাকিতেই তিনি সাধারণ ধর্ম্মসভা স্থাপনের কল্পনা মনে মনে স্থির করিয়া তথাকার কতিপয় ভদ্রলোককে উহার corresponding member সভ্য স্থির করিয়া আসেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বৃষ্টল নগরের ঐ মাদক-নিবারিণী সভা হইতেই ব্রহ্মর্ষি তাঁহার সাধারণ ধর্ম্মসভা এবং দেবালয়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ যেমন 'বরাহনগর মাদক-নিবারিণী' সভা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তেমনি এই সাধারণ ধর্ম্মসভাও সেই বৃষ্টল নগরের মাদক-নিবারিণী সভা হইতে উদ্ভূত। এই দুইয়েরই মূল উৎস মাদক-নিবারিণী সভা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মর্ষি "সাধারণ ধর্ম্মসভা" সংস্থাপিত করেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার কুড়ি বৎসর পরেই ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় চিকাগো সহরে যে মহাধর্ম্মমণ্ডলী হইয়াছিল, উহা ব্রহ্মর্ষি-প্রতিষ্ঠিত এই "সাধারণ ধর্ম্মসভা"র ভাবের বিকাশ মাত্র, একথা বলা যাইতে পারে। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত ব্রহ্মর্ষির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরমহংসদেব এই সাধারণ ধর্ম্মসভার অনেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সঙ্গীত ও আলোচনাদিতে মত্ত হইতেন এবং কতবার ব্রহ্মর্ষির বাড়িতে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই দেখা যায় যে, উপাসনা-

মন্দির কেবল উপাসনার জন্যই ব্যবহৃত হয়। সে-গৃহে আর কোনো কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। উপাসনা প্রার্থনার পর মন্দির মসজিদ এবং চার্চ্চ বন্ধ করা হয়। ব্রহ্মর্ষি বলেন, "সকল সৎকার্য্যই যখন ভগবানের কার্য্য, আর সেই কার্য্যসাধনই যখন তাঁহার উপাসনা, তখন ভজনালয়ে সকলপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই হইতে পারে। এই বিশ্বাসে ব্রহ্মর্ষি বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের দিক হইতে সে চেষ্টায় তিনি বাধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে ঐ ভাবটি প্রবল থাকাতে তিনি তাঁহার শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলের দ্বার সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের জন্যেই উন্মুক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ সৎকার্য্য হওয়ার পক্ষে বাধাই উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউট্ হল প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতিপয় ব্রাহ্ম যখন একটি নূতন সমাজ গঠন করেন, সেইসময়ে সিটি ইস্কুল নামক একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার জন্য ভবানীপুর পিপুলপটীস্থ বাবু দুর্গামোহন দাসের বাটীতে কয়েকটি ব্রাহ্ম বন্ধুর একটি বৈঠক হয়। ভারতের সুসন্তান বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের নূতন ব্রাহ্মসমাজের কি নাম হইবে এই কথা উঠে, ব্রহ্মর্ষি শশিপদ তাঁহার সাধারণ ধর্ম্মসভা হইতে "সাধারণ" এই শব্দটি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রস্তাবিত নূতন সমাজের নাম "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়াই স্থির হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে (১৮৭৮ সালের মে মাসে) ব্রহ্মর্ষি উহার প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এবং উহার নিয়মাবলী প্রণয়নকালে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যের ভাবটি যাহাতে সেখানে রক্ষিত হয় তাহার

জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত মতটি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত না হইলেও তাহার ফলে অনেকটা তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য হইয়াছিল।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ব্রাহ্মসমাজের সেবক। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ বরাবরই রহিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদের জন্য সিটি-কলেজ-ভবনে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে-সভা আহূত হইয়াছিল, ব্রহ্মর্ষি সেদিন অসুস্থ শরীরেও বরাহনগর হইতে আসিয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে কিছু বলিতেও উঠিলেন। তিনি প্রথমে নিজের শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া বলিলেন যে, "ঘরে আগুন লাগিলে সেই বাড়ির লোক যেমন দৌড়িয়া আসে, তাহার গৃহে আগুন লাগিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া সে যেমন সুস্থির থাকিতে পারে না—শত কার্য্য ফেলিয়া শত বাধা ঠেলিয়া সে যেমন গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়, আমি আজ সেইরূপ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অসুস্থ শরীরেও এতদূর হইতে এখানে আসিয়াছি। কেন-না ব্রাহ্মসমাজই আমার গৃহ, ব্রাহ্মসমাজই আমার সুখ, ব্রাহ্ম-সমাজই আমার শান্তি।" সেদিনকার এই কথা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি মনে করেন, তিনি যে-সমস্ত কাজ করিয়াছেন সে-সমস্তই ব্রাহ্মসমাজের কাজ। প্রাচীন হিন্দুসমাজে যে-সকল সৎকার্য্যের অভাব ছিল, প্রাচীন মতে যে-সমস্ত দেশহিতকর কার্য্য নিন্দিত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মই সেইসকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। ব্রহ্মর্ষি আজীবন সেইসকল সংস্কারমূলক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবলী এক একটি করিয়া দেখিলেই এ কথার সত্যতা বুঝা যাইবে। তিনি বরাহ-নগরে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক। সে-সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও স্ত্রীশিক্ষা তেমনভাবে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজের একটি সঙ্গীতে আছে—"সকলের সমান অধিকার।" কিন্তু কার্য্যত সামান্য লোকদিগকে সেই সমান অধিকার কয় জনে দিয়াছেন? প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক জ্ঞানী পণ্ডিতের মত এই যে, "সাধারণ লোকে নিরাকারের উপাসনা করিতে পারে না।" ব্রহ্মর্ষি কার্য্যের দ্বারা ঐ-মত খণ্ডন করিয়াছেন। অনেক শ্রমজীবী নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিত, এবং উপাসনায় তৃপ্তিলাভ করিত। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবের সময়ে বরাহনগর শ্রমজীবিগণের জন্য একটি বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিন ৫০।৬০ জন শ্রমজীবী বরাহনগর হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে আসে। ব্রহ্মর্ষি শশিপদই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মধর্ম্মে যে সকলেই অধিকারী, ব্রহ্মর্ষি শশিপদ একথা কার্য্যদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মর্ষির জীবনে একটি আশ্চার্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তির উচ্ছ্বাসের সহিত কার্য্যের সমতা প্রায় দেখা যায় না। ধর্ম্মোন্মত্ততা প্রায়ই মানুষকে কার্য্য হইতে বিরত করে। আবার কর্ম্মী লোকেরা প্রায়ই ভক্তির উচ্ছ্বাসের পক্ষপাতী নহেন। ব্রহ্মর্ষি একদিকে যেমন ভক্তির উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হন, অপরদিকে তেমনি অক্লান্ত কর্ম্মী। ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তনের সময়ে অনেকবার তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন, ইহাতে কোনো কোনো কর্ম্মী ব্রাহ্ম তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মসমাজের কোনো গোলমালের মধ্যে থাকেন না। যখন নরপূজা লইয়া ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে খুব আন্দোলন উঠে, তখন ব্রহ্মর্ষি তাহার মধ্যে ছিলেন না। পর্দ্দার বাহিরে মেয়েদিগের বসিবার স্থান লইয়া যখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দুই মত হয়, এবং দুই মতস্থ উভয়দলে খুব বাদানুবাদ আরম্ভ হয়, ব্রহ্মর্ষি তাহার মধ্যে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী

পর্দার ভিতরেই বসিতেন। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। কোনোরূপ গোলমালের মধ্যে ব্রহ্মর্ষি থাকিতেন না, কিন্তু কাজের সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই উপস্থিত থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারত-সংস্কার' সভার সময়ে তিনি তাহাতে একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

ব্রহ্মর্ষি আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাতে অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার উপর বিরক্ত। কিন্তু এদিকে নিজ জীবনে এবং পরিবারে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে তিনি সকল সময়েই অগ্রসর। তিনি নিজে ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক আন্দোলনের প্রথম সময়ের উপবীত-ত্যাগী, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের সময়ে তিনি বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই বিবাহ আবার অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছিল। সন্তানদিগের বিবাহ-সময়েও তিনি এই উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় কন্যা ঊষাবালার বিবাহ তিনি একটি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণের সহিত দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মর্ষি তাঁহার সমস্ত জীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। কার্য্যোপলক্ষ্যে তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিয়াছেন। ১৮৭৯ সালে কৃষ্ণনগরে অবস্থান-কালে তিনি গোয়াড়িতে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ১৮৮১ সালে চুয়াডাঙ্গায় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ-বৎসরই 'পোষ্টাপিস ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যিনি যখন যেখানে থাকিতেন, তখন সেইস্থানেই একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া তাঁহারা সকলেই উপাসনা

করিতেন। সেই উপাসনার বিবরণ ব্রহ্মর্ষিকে পাঠাইতে হইত। পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারী-ব্রাহ্মদিগের জন্য এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। পত্রের দ্বারা ইহার কার্য্য হইত। পত্রদ্বারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং সদ্ভাব স্থাপনের ইহা এক উত্তম উপায়। কৃষ্ণগঞ্জে বাসকালে ব্রহ্মর্ষি মাজদিয়া গ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সমাজ-পাড়ায় বরদা বাবুর বাড়িতে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মর্ষি তাহার সম্পাদক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী এবং শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু (Dr. Mrs. Ganguli) ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ঐ বৎসর কলিকাতায় বাসকালে ব্রহ্মর্ষি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বালক-বালিকাদিগকে উপদেশ দিতেন। ১৮৭৬ সালে যখন 'ব্রাহ্ম-পাবলিক-ওপিনিয়ন' নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়, তখন ব্রহ্মর্ষি শশিপদ উহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বাবু ভুবনমোহন দাস উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৩ সালে 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রকাশিত হয়। বাবু শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস এবং ব্রহ্মর্ষি শশিপদ এই চারিজন উক্ত সংবাদ-পত্রের ক্ষতিপূরণের ভার লইয়াছিলেন। প্রথম বৎসর যে-ক্ষতি হইয়াছিল, তাঁহারা চারিজনে তাহা সমান ভাগে পূরণ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে ১১ই মাঘ ব্রহ্মোৎসবের সময় ব্রহ্মর্ষি নববর্ষ পত্রিকা অর্থাৎ নববর্ষের কার্ড সুন্দররূপে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাৎসরিক উৎসবে উপহার দিবার জন্য কার্ড প্রকাশের প্রথা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মর্ষিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮০২ শকাব্দের 'তত্ত্ব-কৌমুদী'তে ঐ-কার্ড সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বিগত উৎসব-উপলক্ষে আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যে নববর্ষ পত্রী (কার্ড) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার

একখণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। কার্ডখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে—

প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর,
এইরূপে দিন কাটুক তোমার।"

১৮৮৩ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটি ট্রাক্ট্ কমিটি গঠিত হয়। ঐ-কমিটি দ্বারা একপয়সা দুইপয়সা মূল্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ-কমিটির কার্য্যভার সমস্তই ব্রহ্মর্ষির হস্তে ছিল।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি একসময়ে বরাহনগরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেশই অধিক। কিন্তু তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী যাহা একটু আধটু ছিল, ব্রহ্মর্ষি তাহাই তাঁহার বক্তৃতার সাররূপে গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র পত্রাকারে ছাপিয়া বহুল বিতরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পত্রও তিনি ছাপিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে ব্রহ্মর্ষির দৃঢ় বিশ্বাস এবং তিনি ঈশ্বরে দৃঢ়নির্ভরশীল। এই অটল বিশ্বাস এবং নির্ভরতার বলেই তিনি অনেকপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিশ্বাস ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী শ্রবণের নামই বিশ্বাস; এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম্ম। সন্দেশ মিষ্ট বটে, কিন্তু ক্ষুধার সময়েই ইহার প্রকৃত মিষ্টতা অনুভূত হয়। দয়াল নাম মিষ্ট, আমরা অনেকসময় দয়াল নাম করি। কিন্তু তিনিই এই নামের প্রকৃত মধুরতা অনুভব করিতে পারেন, যাঁহার প্রাণ প্রভুর জন্য ব্যাকুল। পরিশ্রম করিলে যেমন ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়, আত্মচিন্তা-দ্বারা সেইরূপ প্রাণের ব্যাকুলতা বাড়ে।" এইসকল কথা তিনি কেবল মুখে বলিয়াই নিরস্ত হন নাই,

একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সেই সমিতি হইতে ২৪ পরগণা জেলায় একজন প্রচারক নিযুক্ত করিবার কথা হইয়াছিল। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রচার কার্য্যের ভার লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া একপত্র লিখিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার 'কেশব-একাডেমি' নামক ইস্কুল-বাড়িতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্ম-বন্ধু মিলিত হইয়া একটি সাধকমণ্ডলী করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ঐ মণ্ডলীর সম্পাদক ছিলেন। নিজ নিজ জীবনে ধর্ম্মসাধন এবং জাতীয় ভাবে ধর্ম্মপ্রচার উহার কার্য্য ছিল।

নিরাশ্রয় দুঃখিনী বিধবাদিগকে ব্রহ্মর্ষি নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। ইহাও ব্রাহ্মসমাজের কাজ। এ-সমস্তই ভগবানের প্রিয় কার্য্য—ভগবানের উপাসনা। ব্রহ্মর্ষি এইরূপে অনাথা নিরাশ্রয়া বিধবা-দিগকে আশ্রয়দান, যাহাদের লেখাপড়া শেখার কোনো উপায় নাই সেইরূপ দরিদ্র শ্রমজীবীদিগকে বিদ্যাদান, কুপথগামীকে সৎপথে আনয়ন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধদান প্রভৃতি ভগবানের বিবিধ প্রিয়কার্য্য-দ্বারা আজীবন ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তিনি সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করেন নাই অর্থাৎ বক্তৃতাদি দ্বারা নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার করিয়া বেড়ান নাই। কিন্তু এক-একস্থানে থাকিয়া তিনি কার্য্যের দ্বারা বিশ্বাসের দ্বারা বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। বাক্য অপেক্ষা জীবনের দ্বারাই জগতে প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচার হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম না হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্ম্ম হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মর্ষি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার

দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে ভারতের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলন-ভূমি হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসবের সময় উপাসনা-মন্দিরে ব্রহ্মর্ষি ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধটির নাম "How to make Brahmoism the national religion of the country" (ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপে দেশের জাতীয় ধর্ম্ম করা যাইতে পারে)। এই প্রবন্ধটির পূর্ব্বে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক ইংরাজী-সংবাদপত্র Indian Messengerএ এ-বিষয়ে আর একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি কেবল কথা কহিয়াই নিরস্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি কর্ম্মী লোক, যে-সমস্ত উপায় তিনি বক্তৃতায় বা লেখায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইসমস্ত উপায় তিনি নিজের জীবনে আশ্রয়ও করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনের কথা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিকট ব্রহ্মর্ষি উত্থাপন করিলে তাঁহারা প্রথমে এই বিষয়টি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎপরে ব্রহ্মর্ষি দেবালয়ে প্রতি রবিবার নিয়মিত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করাইলেন। সেই সঙ্কীর্ত্তন ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্থানান্তরিত হয়। পরলোকগত প্রচারক ভক্তিভাজন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপাসনার পর দেবালয়ের সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে গমন করিলেন। সেই হইতে রবিবারে সায়ংকালীন উপাসনার পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে।

ছোট ছোট কার্য্যের মধ্যে লীলাময়ের মঙ্গলহস্ত ব্রহ্মর্ষি কিভাবে অনুভব করিয়াছেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মর্ষি দার্জ্জিলিং গমন করেন। যাইবার দিন বাড়িতে বসিয়া জিনিস-পত্র সাজাইতে সাজাইতে একখানি পুরাতন চিঠি তাঁহার হাতে পড়িল। চিঠিখানি বহুদিন পূর্ব্বে

ঢাকা নববিধান সমাজের শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত। বঙ্গ বাবু ব্রহ্মর্ষির একজন পুরাতন ধর্ম্মবন্ধু। এই পত্রখানি যখন লিখিত হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের নবীন উদ্যমের কাল। তখনো কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে বিরোধ ঘটিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সে এক বড় আনন্দ ও উল্লাসের,—আশা, উদ্দীপনা ও প্রেমের দিন। বহুদিক হইতে বহুলোক আসিয়া একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রাণে-প্রাণে মধুর মিলন। ন্যায় ও সত্যের পতাকা হস্তে লইয়া নানা বিপদ নানা নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইব, এই দৃঢ় সঙ্কল্প সকলেরই চিত্তে হোমানল-শিখার মতো প্রজ্বলিত হইতেছে। তাহার পর সেদিন চলিয়া গিয়াছে, কত ঘাত-প্রতিঘাতের ঝড়ে সে আশার স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। বঙ্গ বাবুর পত্রখানি পাঠ করিয়া যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি ব্রহ্মর্ষির হৃদয়-মধ্যে হঠাৎ ক্রিয়া করিয়া উঠিল! নিমেষের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান ভুলিয়া সেই অতীতের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন! সেইসমস্ত আশা-উদ্দীপনা এবং ভালোবাসা যেন আবার চিত্ত-মধ্যে জাগিয়া উঠিল! সেই ভাবের প্রেরণায় ব্রহ্মর্ষি স্থির করিলেন, বঙ্গ বাবুকে একখানি পত্র লিখিতে হইবে। পত্র লিখিবার জন্য প্রাণে একটা ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কাজের ভিড়ে তখন আর পত্র লেখা হইয়া উঠিল না। তৎপরে তিনি দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলেন। তথায় বাস করিবার সময়ে একদিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন-যোগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দর্শন করিলেন। ইহা অবশ্য কেশব বাবুর মৃত্যুর পরের ঘটনা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত ব্রহ্মর্ষি শশিপদর যে মতের অনৈক্য ছিল না, তাহা নহে। সংসারে এরূপ মতের অনৈক্য হইয়াই থাকে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মর্ষির অগাধ ভক্তি এবং

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। প্রথম যৌবনের ধর্ম্মবন্ধু—কেশব বাবুর নিকট হইতে তিনি যে কত উপকার পাইয়াছেন তাহার সীমা নাই। কেশবচন্দ্রের হৃদয় যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিগলিত হইয়া সেই উচ্ছ্বাস অমৃতময় মধুর বাক্যের মধ্য দিয়া শত শত শ্রোতার পাষাণ হৃদয় বিগলিত করিয়া উপাসনা-স্থলে এক মহাভাবের বন্যা বহাইয়া দিত, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ব্রহ্মর্ষি কতদিন এই ভাব-বন্যায় ভাসিয়াছেন! তাঁহার চিত্তের মধ্যে কতদিন কত বড় বড় আনন্দবার্ত্তা জাগিয়া উঠিয়াছে, নয়নযুগলে কত অশ্রুধারা বহিয়া গিয়াছে—এই সব সুখের স্মৃতি ব্রহ্মর্ষির জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ—বড় যত্নে এই স্মৃতি তিনি ভক্তিপুষ্পে প্রতিদিন হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে পূজা করিয়া থাকেন।"

আজ তিনি পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতের উপর আসিয়াছেন। মহা-যোগীর মতো এই পর্ব্বত কতকাল ভারতবর্ষের শিয়রে অভিভাবক ও গুরুর ন্যায় ধ্যান-সমাধিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, নিজের পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অমৃত-বারিধারা বিতরণ করিয়া ভারতভূমিকে ধন্য করিতেছে। কত যোগী ঋষি সাধু তপস্বী ভক্ত এবং যাজ্ঞিকের পুণ্যস্মৃতি এই পর্ব্বতের প্রতি-অনু-পরমানুতে এখনো সজীব হইয়া রহিয়াছে! এই হিমালয়-পৃষ্ঠে বসতিকালে কেশব বাবুর সহিত স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ—সে আনন্দ অবর্ণনীয়।

ব্রহ্মর্ষি স্বপ্নে দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল! কি কথা হইল তাহা আর সকালবেলায় তাঁহার ঠিক মনে আসিল না। তবে প্রাতঃকালে হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তাহার পর সকালে Indian Mirror পত্র আসিল। উহা খুলিয়া দেখিলেন, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গবর্ণমেণ্টকে বালকদিগের

নীতিশিক্ষাদান-সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রখানি উহাতে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা পড়িয়া ব্রহ্মর্ষির মনে বড়ই আনন্দ হইল। সেইসময়ে প্রতাপ বাবু শিমলা-পাহাড়ে ছিলেন। তখনি ব্রহ্মর্ষি প্রতাপ বাবুকে একখানি পত্র লিখিলেন। সেইপত্রে তিনি প্রতাপ বাবুর মন্তব্যগুলির সহিত নিজের ঐকমত্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে লিখিলেন যে, "ভগবানের বিধানে আপনার ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত একযোগে কার্য্য করার সুবিধা আপনার হইয়া উঠিল না। যাহা হউক ভগবানের লীলা বড়ই চমৎকার, তিনি আপনাকে আর এক নূতন ও আবশ্যকীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। আপনার এই পত্রখানি পড়িয়া এই তত্ত্বটুকু আমার হৃদয়ঙ্গম হইল।" যাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় প্রতাপ বাবুর উত্তর জীবন অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ব্রহ্মর্ষির ঐ-বাক্য কিরূপ সফল হইয়াছিল। কলিকাতার ছাত্রগণের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্' প্রতাপ বাবুর জীবনের একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি।

সেইদিন বৈকালে Darjeeling এর Union Chapelএ উপাসনায় যোগ দিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই উপাসনায় গিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখেন অদূরে বঙ্গবাবু বসিয়া রহিয়াছেন।

ব্রহ্মর্ষি মনেও করিতে পারেন নাই যে, এইস্থানে বঙ্গবাবুর সহিত দেখা হইবে। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার হৃদয়ের এক গুপ্ত কক্ষের দ্বার যেন সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। এক নূতন চিন্ময় আলোক যেন তাঁহার সম্মুখে প্রজ্বলিত হইল। এই আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বের ঘটনাগুলি সম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। তাহা-দের মধ্যে এক অপূর্ব্ব যোগসূত্র রহিয়াছে।

উপাসনা শেষ হওয়ার পর ব্রহ্মর্ষি বঙ্গ বাবুকে সাশ্রুনয়নে ও সপ্রেমে

আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহার সহিত আলাপে সমস্ত কথা—তাঁহার পুরাতন পত্র প্রাপ্তির কথা, তাঁহাকে পত্র লিখিবার সঙ্কল্প এবং তাহা না হওয়ার কথা, তৎপরে কেশব বাবুকে স্বপ্নে দর্শন, প্রতাপবাবুর পত্র প্রাপ্তি, তাঁহাকে পত্র লেখা এই সমস্ত কথাই বলিলেন। ব্রহ্মর্ষির চিত্ত কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। * * * তাহার পরদিন ব্রহ্মর্ষি নানাবিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন, সেইসময়ে হঠাৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কথা তাঁহার মনে উদিত হইল। ভাবিলেন দার্জ্জিলিং হইতে বাড়ি ফিরিয়া একদিন ত্রৈলোক্য বাবুকে বিধবাশ্রমে আনিয়া গান করাইবেন। এই চিন্তা সেদিন তাঁহার মনের মধ্যে থাকিয়া গেল। পরদিন সকালে স্বাস্থ্যাবাসে (Sanitarium) বসিয়া আছেন, এমনসময়ে হঠাৎ ত্রৈলোক্য বাবু সেখানে গিয়া উপস্থিত! পর পর এতগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল। সকলেরই জীবনে এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পর পর সংঘটিত ঘটনাগুলি গভীরভাবে আলোচনা করার অবসর এই ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ব্রহ্মর্ষি দার্জ্জিলিং বাসকালে এই ঘটনাগুলি চিন্তা করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার এক নূতন দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এই ঘটনাটি তিনি প্রায়ই বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার চিন্তার স্রোত এক নূতন পথে চলিতে লাগিল।

ব্রহ্মর্ষি উপদেশ দেন এবং নিজেও খুব গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন যে, আকস্মিক ঘটনা (Accident) বলিয়া একটা জিনিষ নাই। বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে যে, জড়জগতে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম কার্য্য করিতেছে। ভগবানের লীলা বা ইচ্ছাই এইসমস্ত নিয়মের ভিত্তি। সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া সেই আনন্দময় পুরুষ আপনাকে প্রকাশিত করিতে-

ছেন। আকস্মিকতা জগতে নাই—সমস্ত জগৎ এক মহাশৃঙ্খলে আবদ্ধ, এই তত্ত্বটুকু তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই ব্রহ্মর্ষি উপলব্ধি করেন।”

সচরাচর এই দেখা যায় যে, একটু মতের অমিল হইতে, একটু সহানুভূতির অভাব হইতে ক্রমশ শত্রুতার উৎপত্তি হয়। যেমন, বাটীর ছাদের কোথাও একটু ফাটিলে যদি তাহা মেরামত না করা হয়, তাহা হইলে ক্রমে তাহাতে জল বসিয়া বসিয়া গৃহটিকে ভূমিসাৎ করিয়া দ্যায়; সেইরূপ একটু মতের বা সহানুভূতির অভাব উপস্থিত হইলে যদি সদ্ভাব-সংস্থাপনের চেষ্টা না হয়, তবে সেই একটু অমিল হইতেই ক্রমে ক্রমে চিরশত্রুতা বা চিরবিদ্বেষভাব উৎপন্ন হইয়া মানুষের সর্ব্ববিধ পতন উপস্থিত করে। এই একটু অমিল বা অসদ্ভাবকে যাঁহারা প্রথমেই বিদূরিত করিতে পারেন, তাঁহারাই ঠিক রোগ বুঝিয়া উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতে হইলে এই সাধনার একান্ত আবশ্যক। এই সাধনাই মহা-সাধনা—বড় কঠিন। চিরদিন এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সাধারণ সাধকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি সারাজীবন এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ। ব্রহ্মর্ষি শশিপদর জীবনে আমরা চিরদিনই এই সাধনায় অর্থাৎ অমিলে মিল, অসদ্ভাবে সদ্ভাব, সহানুভূতির অভাবে সহানুভূতি-স্থাপনের চেষ্টা প্রভৃতিতে কৃতকার্য্যতা দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে, চিরদিনই তিনি অসদ্ভাবে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কখনো নিজ-মত খর্ব্ব করেন নাই। মতের অমিলই অসদ্ভাব উৎপন্ন করে। সেখানে সদ্ভাব রক্ষা করিতে গেলে প্রায়ই মতের মিল রক্ষা করিতে হয়। ব্রহ্মর্ষি এই সাধারণ নিয়ম খণ্ডন করিয়া বরাবরই অমিলে মিল করিয়া আসিয়া-ছেন। বরাহনগরে থাকিতে তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক মতে অমিল

হওয়াতেই বরাহনগর-বাসী অনেকেই তাঁহার বিরোধী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি ক্রমশ তাঁহাদের সেই বিদ্বেষভাব দূর করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব বন্ধুত্ব-স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। গরীবকে অর্থ দিয়া, বিষয়ীকে সৎপরামর্শ দিয়া, বেকারকে চাকুরি করিয়া দিয়া পূর্ব্ব অত্যাচারীদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু কখনো নিজত্ব হারান নাই, নিজকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত অনেকবার তাঁহার মতের অমিল হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনই ব্রাহ্মসমাজের সহিত মূল মিলন-বন্ধন শিথিল করেন নাই। মতের অমিলের জন্য কতজন ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষির সহিত অনেকবার ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষদিগের মতের অমিল হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি বরাবরই ব্রাহ্মসমাজের সহিত সমানভাবেই সমস্ত যোগ রক্ষা করিয়াও নিজ মতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিবাহ-বন্ধন যেমন ছিন্ন হয় না, বন্ধুত্বের বন্ধনও সেইরূপ অচ্ছেদ্য।" ব্রহ্মর্ষির বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত 'বিধবাশ্রমে'র পূর্ব্বে "হিন্দু' শব্দ লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হয়। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে বিধবাশ্রম দিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ "হিন্দু" শব্দটি থাকায় উহা লইতে পারেন নাই। 'হিন্দু' শব্দ এবং হিন্দুভাব উঠাইয়া দিলে লইতে পারেন বলিলেন। ব্রহ্মর্ষি তাহাতে সম্মত হইলেন না। এই হিন্দু শব্দ ও হিন্দুদিগের প্রবেশাধিকার লইয়া ব্রহ্মর্ষির সহিত ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের আরো কয়েকবার মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি প্রত্যেকবারই নিজমত রক্ষা করিয়াছেন এবং সমাজের সহিত যোগও সমভাবে রক্ষা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মর্ষির একান্ত প্রাণের প্রিয়তম জিনিষ। তিনি ব্রাহ্মসমাজের

মধ্যে থাকিয়াই তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার শেষ কার্য্য "দেবালয়।" তিনি বলেন—"উহা ব্রাহ্মসমাজেরই কাজ। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, এই "দেবালয়" একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। ঐরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, কোনো কোনো লোক ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে গিয়া স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র নিরূপণ করিয়া স্বমতপোষক কার্য্য প্রচার করিয়া থাকেন। যেমন, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, দেবসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, স্বামী বিবেকানন্দ, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি। সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই মনে করিলেন যে, ব্রহ্মর্ষিও বুঝি সেইভাবে সরিয়া পড়িলেন। এবং 'দেবালয়' বুঝি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিকূল একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সাধক ব্রহ্মর্ষি শশিপদর মনোভাব পূর্ব্বাপর একই প্রকার। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি প্রশস্ততর ও দৃঢ়তর হয়, তাহাই তাঁহার প্রাণগত চেষ্টা। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার 'দেবালয়-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রাণের একান্ত প্রিয়তম বস্তু। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি' এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছেন। বাহিরে কোনো কোনো বিষয়ে মতের অমিল থাকিলেও মূলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ তিনি চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানেও যাহাতে ঐ যোগ চিরদিন অচ্ছেদ্য থাকে তাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজের হাতে তিনি এত টাকা দিয়াছেন যে, তাহার সুদ হইতে তাঁহার বাৎসরিক বা মাসিক দান যাহা তিনি [illegible]

এখন দিয়া থাকেন, তাঁহার দেহাবসানের পরেও বরাবর তাহা প্রদত্ত হইবে। এইরূপে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত চিরযোগ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি সারাজীবন ধরিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

ব্রহ্মর্ষি অনেক সময় বলেন, "একগুণ ভগবানকে দিলে তার কতগুণ যে তিনি ফিরাইয়া দেন তাহার সীমা নাই।" ইহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছেন। তিনি আরো বলেন, "মানুষ পরের কাজ করিতে গিয়া মনে করে, পরের সাহায্য করিতে যাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে, উহা দ্বারা নিজেকে গঠিত করা এবং নিজেরই সাহায্য করা হয়।" ব্রহ্মর্ষির কার্য্যকুশলতা এবং শৃঙ্খলা অনন্যসাধারণ। তিনি সর্ব্বদাই বলেন, "যে-লোক নিয়মিত সময়ে একটি সামান্য কাজও সুন্দররূপে করিতে পারে, তাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।"

"লোকের কথাই মূল্যবান। কিন্তু সেই কথার ভিতরে যদি তাহার বিশ্বাস না থাকে তাহাহইলে সেই কথার কোনো মূল্য নাই। সকলের সকল কথায় বিশ্বাস এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায় না, এবং তাহার কোনো মূল্যও নাই। উপদেশ যদি উপদেষ্টার জীবনে আচরিত না হয়, কোনোরূপ Practical shape না পায়, তাহাহইলে সেই উপদেশ দ্বারা কাহারো কোনো উপকার হয় না, তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইয়া যায়।" এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বলেন,—

"The secret of my life-story is this, that He gives thought and I have tried my best to give them shape." "এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তিলাভ করে। কেন-না মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র—সেইখানে স্বার্থ এবং

লোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়—সেইখানে মানুষ নিজের সুখ-দুঃখের, নিজের ভোগ-সম্ভোগের অতীত হ'য়ে বিচরণ করে—সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে না। সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার।"

ব্রহ্মর্ষি-প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের ফল সর্ব্বজনবিদিত। একদা সেই আশ্রমের একটি মেয়ে ব্রহ্মর্ষির নিকট একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সেই ঘটনাটি এই,—ব্রহ্মর্ষি প্রতি একবৎসর অন্তর আশ্রমের প্রত্যেক মেয়েকে তাহার একটি জ্যাকেটের উপযুক্ত গরম কাপড় দিতেন। মেয়েরা তদ্দারা নিজেরাই জ্যাকেট সেলাই করিয়া লইত। এ-বৎসর যাহাকে ঐ-কাপড় দেওয়া হইল, পর-বৎসর আর তাহাকে কাপড় দেওয়া হইত না। এই ছিল ব্রহ্মর্ষির আশ্রমের মেয়েদিগকে গরম জামা দিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। একবার ঐ আশ্রমের একটি মেয়ে—যাহাকে তৎপূর্ব্ব বৎসর ঐরূপ গরম কাপড় দেওয়া হইয়াছিল, ব্রহ্মর্ষিকে বলিল, "বাবা, আমি পূজোর বন্ধে বাড়ি গিয়ে আমার গত বৎসরের গরম জামাটি ভুলক্রমে রেখে এসেছি, আমাকে এবারও ঐরকম গরম কাপড় দিন।" বলা বাহুল্য যে আশ্রমের সমস্ত মেয়েই ব্রহ্মর্ষিকে 'বাবা' এবং তাঁহার স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। ঐ-কথা শুনিয়া ব্রহ্মর্ষি তাহাকে আর কোনো কথা না বলিয়াই তাহাকে তাহার জামার উপযুক্ত গরম কাপড় দিলেন। ঐ-ঘটনার কয়েকদিন পরেই ব্রহ্মর্ষি একদিন প্রাতঃকালীন উপাসনার পর সাধারণভাবে সত্যবাদিতা সম্বন্ধে একটি চমৎকার উপদেশ দিলেন। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, আশ্রমের এবং ব্রহ্মর্ষির নিজবাটীর সমস্ত ছেলেমেয়েকেই প্রতিদিন প্রাতে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে হইত। ব্রহ্মর্ষি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনাস্থলে আসিয়া দেখিতেন যে সকলে উপাসনায়

আসিয়াছে কিনা। একদিন তিনি দেখিলেন যে, একটি মেয়ে উপাসনা-স্থলে আইসে নাই; অনুসন্ধানে জানিলেন তাহার অসুখ হইয়াছে। অমনি তিনি সেই মেয়েটির ঘরে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি উপাসনায় যাওনি কেন?' সে বলিল, 'আমার অসুখ করেছে'। ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, 'তুমি আজ কি খাবে?' সে বলিল, 'দুই-একখানা রুটি খাব'। তাহাতে ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, 'যে রুটি খেতে পারে, সে উপাসনায়ও যেতে পারে, তুমি উপাসনায় এসো।' এই বলিয়া তাহাকে উপাসনায় লইয়া আসিলেন। এই ছিল তাঁহার দৈনিক উপাসনার ব্যবস্থা। যাহা হউক, সেদিনকার সেই উপদেশ শুনিয়া সেই মেয়েটি ব্রহ্মর্ষির পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষি তাহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কী হয়েছে? তুমি কাঁদচ কেন?' সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি।" ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, 'তুমি কী মিথ্যা কথা বলেছ?" সে বলিল "গত বৎসরের সেই গরম জামা আমার কাছেই আছে। আমি মিছে কথা বলে আপনার নিকট হতে এবার আবার গরম কাপড় নিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করুন।" ইহাকেই বলে উপদেশ। "মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবিকালবিহারী তারাই অমৃত-লোকের অধিবাসী, কেন-না মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্ছে বর্ত্তমান। এইখানেই পদে পদে ক্ষয়, এইখানেই যত আঘাত যত নৈরাশ্য— এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়। মানুষ হচ্ছে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", মানুষ হচ্ছে দিব্যধামবাসী, সেই দিব্যধাম হচ্ছে অসীম কালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন * * * মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম্ম করতে নিযুক্ত সেইখানেই আত্মার হীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণতায় যদি বদ্ধ হয় তাহলে

বাতাস দূষিত হয়ে উঠে। * * মানুষ যখন তার কীর্তির জন্য বৃহৎ কালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতেই পারে না। সে আপন অভাবকে—হীনতাকেই ব্যক্ত করে।" এদেশে উপদেষ্টার অভাব নাই, এবং উপদেশেরও বিরাম নাই। কিন্তু কয়জন উপদেষ্টার কয়টি উপদেশে কয়জন লোকের চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে? নিজের জীবন, নিজের আচরণ যদি উপদেশের অনুরূপ না হয়, তাহা হইলে সেই উপদেষ্টার উপদেশে তাহাদের কোনো উপকার হয় না। ব্রহ্মর্ষি শশিপদর উপদেশগুলি অত্যন্ত Practical, তাহাতে বড় বড় তত্ত্ব-কথার প্রাচুর্য্য নাই। কথায় কথায় শাস্ত্র-বাক্যোদ্ধার নাই, গভীর দার্শনিক বিচার অথবা উচ্ছ্বাসের ছড়াছড়িও নাই। আছে সরল অকপট সত্য—নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য। তাঁহার একটি উপদেশের ফল পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর একটি উপদেশের ফল লিখিত হইল।

আর একবার ব্রহ্মর্ষির ঐ বিধবাশ্রমের একটি মেয়ে ব্রহ্মর্ষির বাড়ি হইতে একসেট্ সুন্দর চায়ের পেয়ালা-পিরীচ চুরি করিয়াছিল। সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তখন উহা পাওয়া গেল না। পরে একদিন ঐ-মেয়েটির বিছানার পার্শ্বে উহা দেখা গেল। সে উহা সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী উহা দেখিতে পাইয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন। ব্রহ্মর্ষি উহা দেখিয়া চলিয়া গেলেন, সেই মেয়েটিকে কোনো কথাই বলিলেন না। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—"তুমি ওকে একটি কথাও বল্লে না, বাড়ির জিনিস চুরি করে নিয়ে সাজিয়ে রেখেছে, তুমি তা দেখেও চুপ করে রইলে!" ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, "জিনিস তো কোথাও যায় নি, বাড়ির জিনিস বাড়িতেই তো আছে।"

উহার কয়েকদিন পরে প্রাতঃকালীন দৈনিক উপাসনায় ব্রহ্মর্ষি একদিন চুরি করার দোষ ও অপকারিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি মর্মস্পর্শী উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কাহারো নাম বা কোনো ঘটনার উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। ঐ উপদেশ শুনিয়া সেই মেয়েটি উপাসনার পর ব্রহ্মর্ষির পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষি তাহাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কী হয়েছে? তুমি কাঁদচ কেন?" সে বলিল "বাবা, আমি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছি, আমায় ক্ষমা করুন।" তিনি বলিলেন, "তুমি কী অন্যায় কাজ করেছ?"—"বাবা, আমি আপনাদের পেয়ালা-পিরীচ চুরি করেছি, আমার পরিণাম কি হবে বাবা!—আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মর্ষি তাহাকে স্নেহভরে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন। উপদেশ দিবার ক্ষমতা ব্রহ্মর্ষির এইরূপই ছিল।

বালক-বালিকাদিগকে উপদেশ দিতে হইলে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তেই অধিক ফল হয়। একসময় বিড়ালছানা লইয়া একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, একদা একটি বিড়ালছানা ক্রমান্বয়ে দুই গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু উভয় গৃহস্থই ছানাটিকে বিরক্তির সহিত পদাঘাতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁহাদের বালক-বালিকাগণ ব্যথিতঅন্তঃকরণে ব্রহ্মর্ষির বাড়ির সিঁড়ির নিকট বিড়ালছানাটিকে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি তখন উপর হইতে নামিতেছিলেন, তিনি ঐ বিড়ালছানাটিকে দেখিয়া বলিলেন,—"বাঃ বেশ সুন্দর বিড়ালছানাটি তো!" ইহা শুনিয়া ঐ বালক-বালিকাগণ তাহাদের মাতাপিতার দুর্ব্যবহার ব্রহ্মর্ষির নিকট অতি দুঃখের সহিত বলিল, এবং ঐ বিড়ালছানাটির জন্য তাঁহার নিকট একটু দুধ চাহিল।

ব্রহ্মর্ষি তাহা শুনিয়া আনন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে উহাদিগকে দুধ কিনিবার জন্য পয়সা দিলেন। ঐ পয়সা পাইয়া উহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। ইতর প্রাণীদিগকে ভালোবাসা ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাভাবিক নিয়ম। দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে জীবে দয়ার ভাব বর্দ্ধিত করা প্রত্যেক পিতামাতারই উচিত। কিন্তু হায়, কি দুঃখের বিষয়, অনেক অভিভাবকই বালক-বালিকাগণকে মৌখিক উপদেশ দিয়াও তদ্বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সেই উপদেশ নিস্ফল করেন।

দেবালয়ের জন্য ব্রহ্মর্ষি সর্ব্বদাই গভীর চিন্তা করেন। এই চিন্তার ফলে একদিন তিনি মনে করিলেন যে, ভিক্ষাস্বরূপ দান গ্রহণের চেষ্টা করা প্রয়োজন। তজ্জন্য দেবালয়ের উপাসনা-স্থলে একটি দান-পাত্র বা থালা রাখা হইবে। এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় দ্বারা 'দান' সম্বন্ধে উপদেশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই ভাব মনে আসিবামাত্র তাঁহার কর্ম্মকুশল বুদ্ধি এই ভাবের বিকাশের পথে ধাবিত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুখতারা দত্তের নিকট হইতে 'দানপাত্র' আনয়ন করিলেন, এবং তিনি মাসিক দান এক টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সমাজ-পাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী বার-এ্যাট্-ল, এবং বাবু রমণীমোহন রায় প্রভৃতি অনেকের নিকট হইতেই মাসিক চাঁদা এবং এককালীন দান সংগৃহীত হইল।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বালকের সঙ্গে বালক, চিরকালই বালক। এখনো তিনি সমাজ-পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেশেন। তাহাদের প্রত্যেকেরই তিনি আপনার জন। সকলেরই আব্দার তাঁহার নিকটে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় এবিষয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি লিখিয়াছেন ;—

"তাঁহার (ব্রহ্মর্ষির) এইভাব চিরদিনই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, বেড়াইতে কষ্ট হয়, সেজন্য তিনি প্রতিদিন বৈকালে মন্দিরের পশ্চাতের প্রাঙ্গণে আরাম-চেয়ারে বসিয়া থাকেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া গান এবং নানাপ্রকার আমোদ করে। তিনি তাহা বেশ সম্ভোগ করেন। ব্রাহ্মপল্লীর স্ত্রীলোকেরা একবার বলিলেন, 'আপনার শরীর অসুস্থ, কন্যার বাড়ি গিয়া থাকিলে ভাল হয়, সেখানে নাতি নাৎনীরা আছে, আপনার ভাল লাগিবে।' তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—'এখানেও অনেক নাতি-নাৎনী আছে'।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত সাধনাশ্রম-সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষি একদিন বলেন,—"Help to the Sadhanashram not for helping the institution but to help myself brs." ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ব্রহ্মর্ষি একদিন বলেন,——"Examination of health, mind and spirit prayerfully; that is my definet-ion of Religion."

একবার সাধনাশ্রমের মান্দ্রাজ শাখার প্রচারক মিঃ ই, সুব্বাকৃষ্ণায়া তথাকার সাধনাশ্রমের কার্য্যাদির জন্য ব্রহ্মর্ষির নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়া এক পত্র লেখেন। ব্রহ্মর্ষি ঐ-পত্র পাইয়া তাঁহাকে দশ টাকা পাঠাইয়া দেন।

নববিধান সমাজের কয়েকটি উৎসাহী যুবক মিলিয়া কলিকাতায় শ্রমজীবিদিগের শিক্ষার জন্য একটি ইস্কুল করিয়াছেন। উহার প্রথম বাৎসরিক পারিতোষিক-বিতরণ-উপলক্ষ্যে ব্রহ্মর্ষি নগদ দুই টাকা এবং বাংলা 'ইন্দুবালা' নামক পুস্তক দশখানা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মর্ষি এখন বরাহনগরে থাকেন না, তথাপি তিনি যে-কার্য্যের

সূত্রপাত করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখনো চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মর্ষি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির হস্তে ২০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। শ্রমজীবিগণের শিক্ষার জন্য বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করাই ইহার উদ্দেশ্য। শ্রমজীবিগণকে Practical Religon and morality অর্থাৎ যে-শিক্ষা দ্বারা বাস্তব জীবনে ধর্ম্মভাব ও সুনীতির সঞ্চার হইবে তাহারই জন্য এই অর্থ প্রদান করেন। কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া দাতার অভিপ্রায় নহে। এই কার্য্যের মধ্যেও দেবালয়ের উদার ভিত্তির সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে।"

"ব্রহ্মর্ষির এই চেষ্টা সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। যাহারা অস্পৃশ্য ও অজলাচরণীয় বলিয়া সমাজে প্রত্যাখ্যাত, ব্রহ্মর্ষি তাহাদেরও বন্ধু। চণ্ডাল কেওরা প্রভৃতি জাতির সহিত তিনি সমান-ভাবে মিশিতেন এবং তাহাদের শুভকল্পে শ্রম করিতেন।"

"ব্রহ্মর্ষি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের জন্য কেবল যে বরাহনগরেই কার্য্য করিয়াছেন তাহা নহে। পূর্ব্বে তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন সেই সময়ে দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন,—একটি সিটিকলেজে, আর একটি কেশব-একাডেমিতে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সাধকমণ্ডলী নামক যে কর্ম্মীদল প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মর্ষি তাহার সম্পাদক ছিলেন—ঐ সমিতির অধিবেশন তাঁহার বাড়িতেই হইত। এই সমিতি হইতেই উক্ত নৈশ-বিদ্যালয় দুইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসময়ে তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুরোধে প্রত্যহ সকালে ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইতেন। ঐ-সময়ে তিনি চট্টগ্রামের মাঝিদের একনৌকায় যাইয়া বসিতেন। সেইসমস্ত মাঝি তাঁহার মধুর সরল অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চারিদিকে আসিয়া বসিত। আর তিনি তাহাদিগকে বই পড়িয়া শুনাইতেন, নানারূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন।

এবং ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি তাহাদের খাবার আনিয়া দিতেন ও একত্রে আহার করিতেন।"

"দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রহ্মর্ষি শশিপদর সহিত হিন্দু-সমাজের একজন বিশিষ্ট ভদ্র লোকের আলাপ হইতেছিল। সেই হিন্দু ভদ্র লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি 'দেবালয়ে' সকলসম্প্রদায়কে যখন সমান আদরে স্থান দিয়াছেন, তখন উপাসনাটি ব্রাহ্মমতে রাখিলেন কেন? এ-বিষয়ে আপনি ত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যে একদিন শিবপূজা হইবে, একদিন কালীপূজা হইবে, একদিন খৃষ্টীয় মতে উপাসনা হইবে ইত্যাদি।" ঐ প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া এই যে ব্রহ্মোপাসনা, ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই উপাসনাই ধর্ম্মসাধনার সার জিনিস। এই ব্রহ্মোপাসনাদ্বারাই সকল মানবের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই ক্রমে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবে।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম না হইয়া যাহাতে জগতের যাবতীয় নরনারীর জাতীয় ধর্ম্ম হয়, ব্রহ্মর্ষি শশিপদ তজ্জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে জগতের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মিলন-ভূমি হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। (২৬শে জানুয়ারি ১৯০৪)। এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে সেইসময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধটির নাম "How to make Brahmoism the national religion of the country" ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপে দেশের জাতীয় ধর্ম্ম করা যাইতে পারে? ইহার পূর্ব্বে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ-পত্র Indian Messengerএ এ-বিষয়ে আরো একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি উপায় নির্দ্ধারণ করেন। সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিন জাতীয় ধর্ম্ম হইতে পারিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেন, সর্ব্বপ্রথম আমাদের নিজেদের ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই, বিশ্বাস ছাড়া কিছুই হইবে না—আর বিশ্বাসের দ্বারাই সমস্ত হইবে। তাহার পর একতা—একতা ভিন্ন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তৃতীয়ত, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও ঋষিদিগের সহিত আমাদের যোগ রক্ষা করিতে হইবে। চতুর্থত, সর্ব্বসাধারণের উপযোগী সাহিত্য চাই। এখন সমাজের যে-সাহিত্য আছে তাহা সাধারণ লোকের উপযোগী নহে। এই যে লোক-সাহিত্য, ইহাতে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের নীতিগুলি বুঝানো হইবে, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা কি কার্য্য হইতেছে, কত জগাই মাধাই এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন—সেইসমস্ত ইতিহাস বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত। পঞ্চমত, স্ত্রীশিক্ষার দিকে আমাদিগকে আরো মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা এতদিন তাঁহাদিগকে সাধারণ বিষয়েই শিক্ষা দিয়াছি, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান বিষয়ে আমাদিগকে এখন বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। রীতিমত ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন এরূপ স্ত্রীলোক আমাদের সমাজে একজনও নাই। বৈষ্ণবসমাজে প্রথম হইতেই স্ত্রীলোকেরা রীতিমত ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। নগর-সংকীর্ত্তন এবং সাধারণ কীর্ত্তন-বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। অবশ্য সংকীর্ত্তনে উৎসাহ এবং জীবন থাকা চাই। আর একটি কথা এই যে, সাধারণ লোকের বিশেষ যোগ

ছাড়া জগতে কোনো আন্দোলনই কেবলমাত্র শিক্ষিত কয়েকজন লোককে লইয়া সফলতা লাভ করে নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাধারণ লোককে আনিতে হইলে দেশের লোকশিক্ষার ভার বিস্তৃততররূপে ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশ-মধ্যে বহুস্থানে নৈশ-বিদ্যালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইসমস্ত নৈশ-বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মশিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

"এইস্থানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ব্রহ্মর্ষি কেবল কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি কর্ম্মীলোক। পূর্ব্বে যে-সমস্ত উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহার সবগুলিই নিজের জীবনে তিনি অবলম্বনও করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনের কথা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কমিটির নিকট তিনি উত্থাপন করিলে তাঁহারা প্রথমে উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎপরে ব্রহ্মর্ষি 'দেবালয়ে' প্রতি রবিবারে নিয়মিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করাইলেন। দেবালয়ের ঐ সংকীর্ত্তন ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়।"

ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপাসনার পর 'দেবালয়ে'র সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তদবধি প্রতি রবিবার উপাসনার পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে সংকীর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্মর্ষি-শশিপদই অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি যে-সময়ে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন (১৮৬১ খৃঃ), সে-সময়ে খৃষ্টীয় সমাজও অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এখন অবশ্য এ-বিষয়ে দেশে নানারূপ কার্য্য হইতেছে। সরকার বাহাদুরও অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক অন্তঃপুর

শিক্ষা আরব্ধ হওয়ার দুইবৎসর পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধু সভায় অন্তঃপুর-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।"*

"ব্রহ্মর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম খুব সংক্ষিপ্ত—ইহার গোড়ার কথা এই যে আধ্যাত্মিক জীবন একটা আনুমানিক বা কাল্পনিক ব্যাপার নহে—প্রত্যক্ষ সত্য। এই আধ্যাত্মিক জীবনকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের ভৌতিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক জীবনকে তদ্দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম। আদর্শ ও কর্ম্ম-প্রণালী ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার জীবনে এই ভাবটি ফুটিয়াছে শশিপদ বাবুর মতে তিনি ব্রাহ্ম। সত্যের আলোক সকলের কাছে একরূপ নহে—কিন্তু সকলেই সত্যের আলোক সরলভাবে অনুসরণ করুন—সেবাব্রত গ্রহণ করুন, ইহাই শশিপদ বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্ম।" (নবযুগের সাধনা—৪২৩ পৃষ্ঠা)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে "ব্রহ্মসঙ্গীত" পুস্তক যখন প্রকাশিত হয়, সেইসময় ব্রহ্মর্ষি শশিপদ-রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার ইস্কুলের পণ্ডিত বাবু কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বরাহনগর হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান। সেই গানগুলির নীচে শশিপদ বাবুর নাম ছিল না, সুতরাং সেই গানগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতে উক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামেই প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৯ সালের শেষভাগে ব্রহ্মর্ষি যখন গিরিডিতে ছিলেন, সেই সময়ে একদিন তিনি তাঁহার ডায়েরিতে লিখিলেন,—"আমার জীবন এখন আমার ভোগের জিনিস। কত ঝড় বৃষ্টি রোদ্র ও উত্তাপ সহ্য করে তবে গাছে ফলটি পাকে। কত আয়োজন, কত পরিশ্রম, কত

* প্রবাসী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

দ্রব্য সংগ্রহ এবং বার বার অগ্নির সহিত সংস্পর্শ, তবে একটি মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। আমার জীবন সেইরূপ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ভগবান স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এ তাঁহারই দান। আমি এখন কেবলই ভোগ করিতেছি।"

ব্রাহ্মর্ষির কন্যা ইন্দুবালা যখন পীড়িতা ছিলেন, তখন তাঁহারা কিছু-দিনের জন্য কলিকাতা হাতিবাগানে বাস করিতেন। তখন তাঁহাদের বাড়িতে প্রতিদিন উপাসনা হইত। এবং উপাসনান্তে আহার হইত। একদিন এইরূপ উপাসনার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, অথচ যাঁহার উপর উপাসনার ভার তিনি আসিতেছেন না। সকলেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার আসার সময় অতীত হইয়া গেলে ব্রহ্মর্ষি তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে—রাস্তায় অনেক জল দাঁড়াইয়াছে। ট্রামের জন্য তিনি একটু অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ট্রাম বন্ধ, সুতরাং হাঁটিয়াই সমাজ-পাড়ায় বর্ত্তমান সাধনাশ্রমের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের তাঁহার বাড়িতে যাইবার কথা ছিল, তাঁহারা বৃষ্টির জন্য বাহির হইতে না পারিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মর্ষিকে দেখিয়া অবাক্। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, 'এই বৃষ্টির মধ্যে আপনি কি করে এলেন?' শশিপদ বাবু বলিলেন, 'আপনাদের আজ আমাদের বাড়ি যাবার কথা ছিল, কই আপনারা তো গেলেন না! আমি সেইজন্যই আপনাদিগকে নিতে এসেছি।' তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—'মশায়, যে বৃষ্টি, এতে কি আর বার হওয়া যায়?' ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,—'সে কি মশায়, যখন যাবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন, তখন বৃষ্টি হোক্ আর যাই হোক্ যেতেই হবে। বৃষ্টিতে যদি ভগবানের নাম ধুয়ে মুছে যায়, তবে আর আপনারা প্রচার

করবেন কেমন করে?' তৎপরে সকলে মিলিয়া ব্রহ্মর্ষির বাড়িতে গেলেন এবং যথারীতি উপাসনাদি করিলেন।

ব্রহ্মর্ষি একদিন গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকট বেড়াইতে গিয়া তাঁহার কোনো সঙ্গীকে বলিলেন, 'মনুমেণ্টের নিকট আসায় দূরের গাড়ি-ঘোড়ার এবং জনঃকোলাহলের শব্দ অল্পই শুনা যাইতেছে, কিন্তু এই মনুমেণ্টের উপরে উঠিলে ঐ শব্দ একেবারেই শুনা যাইবে না। সেইরূপ ব্রহ্মসন্নিধানে আসিলে সংসারের কোলাহল অতি অল্পই শুনা যাইবে, এবং ব্রহ্মে তন্ময় হইতে পারিলে একেবারেই শুনা যাইবে না।' আর একদিন ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, 'যেমন 'কোনো কোলাহলের মধ্যে থাকিলে কাহারো ডাক সহজে শুনা যায় না, কিন্তু কান পাতিয়া থাকিলে তবে সেই ডাক শুনিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ এই সংসার-কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে পরমেশ্বরের চিরন্তন আহ্বান আমরা শুনিতে পাই না, কিন্তু তাঁহার দিকে উৎকর্ণ হইয়া থাকিলেই আমরা তাঁহার বাণী শুনিতে পাইব।'

একদিন চৌরঙ্গীতে বেড়াইতে গিয়া ব্রাহ্মর্ষি দেখিলেন যে এক ইংরেজ ভদ্রলোক কতকগুলি কুকুরকে শিকল ধরিয়া লইয়া আসিলেন। পরে মাঠে আসিয়া তাহাদের শিকল খুলিয়া দিলেন। কিন্তু কুকুরগুলি শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াও ঐ সাহেবের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল না, বরং তাঁহার চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রহ্মর্ষি তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "পরমেশ্বরও আমাদিগকে তাঁহার অধীনতায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, যদি আমরা তাঁহার প্রকৃত ভক্ত হই তাহাহইলে তিনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেও আমরা তাঁহাকে ছাড়িতে পারিব না। তাঁহার অধীনতাতেই আমরা আনন্দ বোধ করিব।"

প্রত্যেক লোকেরই বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের নরনারী মাত্রেরই

মিতব্যয়িতা শিক্ষা করা আবশ্যক। মিতব্যয়ী হইতে না পারিলে জীবনে উন্নতিলাভের আশা অতি অল্পই থাকে। ব্রহ্মর্ষির জীবনে বরাবরই এই মিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষ বয়সেও তাঁহাতে যে-মিতব্যয়িতা দেখিয়াছি তাহা অতি আশ্চর্য্য। আমি তাঁহাকে একটি পাকা বেল পাঁচ দিন পর্য্যন্ত খাইতে দেখিয়াছি। উহা রাখিবার কৌশল বড় সুন্দর। পঞ্চম দিনেও উহা কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। ইহা কি আমাদের শিক্ষনীয় নয়?

সুরেন্দ্রনাথ নামে একটি ব্রাহ্মযুবকের স্ত্রীর নাম প্রেমলতা। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র মনের মিল ছিল না। প্রায় সর্ব্বদাই উভয়ে কলহ-বিবাদে রত থাকিতেন। স্ত্রী স্বামীর গৃহে যাইতে চাহিতেন না। সুরেন্দ্র আসিয়া প্রেমলতাকে নিজের নিকটে লইয়া যাইতে চাহিলেন। প্রেমলতা কিছুতেই যাইতে সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রেমলতার মাতা কন্যাকে জামাতার নিকট পাঠাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। এদিকে সুরেন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য ভদ্রলোকদিগকে মধ্যস্থ মানিলেন। এবং নানারূপ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি স্ত্রীকে পাইবার জন্য তাহার নামে আদালতে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু প্রেমলতার মাতা উহা জানিতে পারিয়া কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন। সুরেন্দ্র অনেক অনুসন্ধান করিয়াও স্ত্রীর খোঁজ পাইলেন না। অবশেষে ওয়ারেণ্ট করিলেন। এইবার সুরেন্দ্রের শাশুড়ী ভয় পাইয়া আইনজ্ঞদিগের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। উকীলেরা অভয় দিলেন। ঐকথা জানিতে পারিয়া সুরেন্দ্র কয়েকজন ব্রাহ্মের নিকট আপনার স্ত্রীকে উপস্থিত করাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই

কিছু হইল না। একদিন ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের বাড়িতে গিয়া দেখিলেন, তথায় সুরেন্দ্রের শাশুড়ী বসিয়া আছেন। নানারূপ কথোপকথনের পর ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে কন্যা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তথায় সমাগত অন্যান্য ভদ্রলোকেরাও সুরেন্দ্রের শাশুড়ীকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু তিনি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া জামাতার উদ্দেশে নানারূপ কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সুতরাং সকলেই হতাশ হইলেন। এমন সময়ে সুরেন্দ্র আসিয়া দ্বারের নিকট হইতে ভিতরে শাশুড়ীকে দেখিয়া অন্তরাল হইতে সমস্ত কথা-বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ বাহিরে আসিয়া সুরেন্দ্রকে তথায় রোদনোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন সুরেন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি শাশুড়ীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।" সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মর্ষির আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তাঁহার শাশুড়ীও কাঁদিয়া ফেলিলেন। সব মিটিয়া গেল। ব্রহ্মর্ষি এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা সে-স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে ফিরিয়া আসিয়া শাশুড়ী ও জামাতা উভয়ের কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন না। সুন্দরী বাবুর স্ত্রী শশিপদ বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "শরৎ (প্রেমলতার মাতা) কোথায়? তাকে ডেকে প্রেমলতাকে সুরেন্দ্রের নিকট দিতে বলুন না!" ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, "তাদের মিলন হ'য়ে গেছে, কিন্তু তারা কোথায়? তাদের দেখছিনা তো!" পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাঁহারা বাড়িভাড়া করিতে গিয়াছেন। সেই হইতে সুরেন্দ্র ও প্রেমলতা একত্রে সংসার করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইপ্রকার শান্তি-সংস্থাপনের চেষ্টা ব্রহ্মর্ষির জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শিরোরত্ন-প্রণীত

"শান্তি-সংস্থাপক শশিপদ" নামক পুস্তকে ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।

কি এদেশের কি বিদেশের অনেক শিক্ষিত লোকও বিশ্বাস করেন যে, কোনো মূর্ত্তি বা কোনো মধ্যবর্ত্তী ব্যতীত পরমেশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস বা প্রেম জন্মিতে পারে না। এ-যুক্তির যে কোনোই মূল্য নাই, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসকেরা তাহা জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অবতারবাদীরা যে-সকল শক্তিশালী ঈশ্বরভক্ত সাধুকে উচ্চতম স্থানে অথবা পরমেশ্বরের আসনে বসাইয়াছেন, সেইসমস্ত অবতারই মরণশীল মানুষ ছিলেন। জগতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে যীশু মহম্মদ বুদ্ধ নানক কবীর প্রভৃতি সকলেই নিরাকার পরমেশ্বরেরই উপাসক ছিলেন। তাঁহারা কি কোনো অবতার বা মূর্ত্তির সাহায্যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন? যীশু পরমেশ্বরকে 'স্বর্গস্থ পিতা' বলিয়া ডাকিতেন। মহম্মদ হেরা পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহার মধ্যে পরমেশ্বরের গম্ভীর আহ্বান স্বীয় অন্তরের মধ্যে শ্রবণ করিয়া আরবদেশে একমাত্র পরমেশ্বরেরই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসকেরা কি জীবনে পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি ও বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই? অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ঋষিদিগের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সেই ভূমা পরমেশ্বরকে রসস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই? ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে, অথচ মহর্ষি ধ্যানমগ্ন! এ দৃষ্টান্ত আমাদের অনেকের চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতেন? সেই চিন্ময় অরূপের রূপমাধুরী দর্শন করিয়াই তিনি আনন্দে বিভোর থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজে ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে

ভগবৎ প্রীতি ভক্তি ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু তৎসমুদয়ের উল্লেখ এখানে সম্ভবপর নহে। বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মর্ষি শশিপদ একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়াই নিজ জীবনকে চিরদিন সতেজ ও আনন্দময় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।" ব্রহ্মর্ষি তাঁহার দৈনন্দিন-লিপির একস্থানে লিখিয়াছেন,—"আমি কেবল সেই নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্মেরই দিকে তাকাইয়া অবিচলিতভাবে কর্ত্তব্যের পথে স্থির থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।"

১৯০৬ সালের ৮ই জুন তারিখে একটি ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যার এই সংসারের নানা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চলতে হচ্চে এমন কোনো যুবকের পক্ষে মনের পূর্ণ স্থিরতা সম্ভবপর কিনা?" ব্রহ্মর্ষি ঐ প্রশ্ন শুনিবামাত্রই উত্তরে বলিলেন,—'না'। তাহাতে সেই ভদ্রলোকটি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন দেখিয়া ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে বলিলেন,—"পুকুরের মাঝখানে একজন লোককে ধীর স্থিরভাবে ভাস্‌তে দেখে কোনো বালক ভাবতে পারে যে, আমি কি করে' ঐরূপভাবে ভাস্‌তে পারবো! কিন্তু তার পক্ষে তখন ওরূপ স্থিরভাবে জলের মধ্যে থাকা অসম্ভব। তাকে অনেক হাবুডুবু খেতে হবে, কতবার হয়ত ডুবতে হবে, তবে সে সাঁতার শিখতে পারবে, এবং তারপরে ঐরূপভাবে থাকতে পারবে। সেইরূপ একজন তরুণ বয়স্ক যুবক যিনি কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেছেন, তাঁকেও ঐরূপ কত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে কত নাকাল হয়ে তবে প্রকৃত স্থিরতা লাভ করতে হবে। মনে করলেই পূর্ণ স্থিরতা আসে না। অনেক সংগ্রাম করে তবে তা পাওয়া যায়। এ ছাড়া আবার ভাবী বিপদের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এমনি করে সাধন করতে করতে মন এরূপ স্থির হয় যে তখন বিপদকালেও আর চঞ্চল

হয় না। আমার অবস্থা যখন তেমন স্বচ্ছল নয়, তখন একবার আমার একখানি একশত টাকার নোট হারিয়েছিল। আমার সেই অবস্থায় একশত টাকার নোট বড় কম নয়। খুব খুঁজতে আরম্ভ করলুম, কিছুক্ষণ খোঁজার পর দেখলুম মনটা চঞ্চল হয়েছে। অমনি মনকে লাগাম দিয়ে টেনে ধরলুম এবং খোঁজা বন্ধ করে দিলুম। দু-তিন দিন পরে আপনা আপনিই নোটখানা পেলুম।"

"একদিন স্নান করে বাড়ি ফিরচি, শরীর-মনে পবিত্রতার স্নিগ্ধতা অনুভব করচি, এমনসময়ে দেখলুম সামনে এক মেথর এক বাল্‌তি ময়লা নিয়ে যাচ্চে। দেখে মনকে প্রশ্ন করলুম,—'মন, তুমি কি এখন ঐ বালতি ছুঁতে পার?' মন উত্তর করলে 'হাঁ'। এইরূপভাবে সর্ব্বদাই মনকে পরীক্ষা করতে হবে। অন্যের বিপদ দেখে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'মন, তুমি ঐরূপ বিপদে স্থির থাকতে পারবে ত'?"

এই কথার পর সেই ভদ্রলোকটি ব্রহ্মর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখুন, আমার নিজের সম্বন্ধে দেখচি যে আমার নিজের কোনো বিশেষ অভাব বোধ না হ'লে আমি প্রার্থনা করতে পারি না।"

ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, "তাই ঠিক। যার যেমন অভাব তার তেমনি প্রার্থনা। একজন যুবক মনে করে যে, আমার মাসে ত্রিশ টাকা হলেই হবে। একজন সংসারী লোক দু'শো টাকা চায়। যে ধর্ম্মজগতে শিশু, সে শিশুর মতোই চাইবে। যার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বেশী, সে কখনই অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। একদিন দুটি ব্রাহ্ম বন্ধু এমন একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেছিলেন, যা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে যারা কেবল নতুন ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেছে, এ-গান তো তাদেরই উপযোগী। যদি পঁচিশ বছর যাবত ধর্ম্মসাধন—উপাসনা প্রার্থনাদি করে মনের পুরোণো ব্যথাগুলো না গেল তবে আর ধর্ম্মের শক্তি কোথায়?"

"শশিপদ বাবুর শত্রুতাচরণ অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন। কেবল ক্ষমা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, পরন্তু তাহাদের বিপদের সময়ে সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—শশিপদ বাবু বরাহনগরের পুরাতন পৈতৃক বাটী ছাড়িয়া বরাহনগর নিয়োগীপাড়ায় নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ-বাটীর সন্নিকটে এক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। নূতন বাটী সম্পূর্ণ না হইতেই শশিপদ বাবু সপরিবারে ঐ-বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ-ব্রাহ্মণ শশিপদ বাবুর বাস উঠাইবার নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। শশিপদ বাবু ব্রাহ্ম এবং সমাজ-সংস্কারক বলিয়াই তাঁহার উপর আক্রোশ। শশিপদ বাবুর বাটীর বাহির দরজায় প্রত্যহ মলত্যাগ করিয়া যাইত। শশিপদ বাবু তাঁহার বিধবা ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিবার জন্য কিছুদিন সপরিবারে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ঐ-ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীর জানালা কপাট প্রভৃতি চুরি করিয়া লইয়া গেল। বাগান তছরূপ করিল; অরাজক রাজ্যে দস্যুরা যেমন লুটপাট করে, সেইরূপ করিল। শশিপদ বাবু তাঁহার ভাগিনেয়ীর বিবাহের পর বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ঘরে জানালা কপাট পর্য্যন্ত নাই; বাগানে অনেক গাছপালা নাই। এ-কার্য্য যাহারা করিয়াছে তিনি তাহা জানিতে পারিলেন, কিন্তু জানিয়াও তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। পরে ঐ-ব্রাহ্মণের দুঃসময় উপস্থিত হইলে শশিপদ বাবু তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার পুত্রের চাকরি করিয়া দিয়াছেন। ঐ-ব্রাহ্মণ একবার ভীষণ কলেরারোগে আক্রান্ত হইলে শশিপদ বাবু নিজে ডাক্তার দেখাইয়াছেন ও ঔষধ দিয়াছেন। শত্রুকেও যিনি এইরূপ সাহায্য করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম—তিনি ব্রহ্মর্ষি।"

ব্রহ্মর্ষি তাঁহার জীবনগঠন-সম্বন্ধে নিজে বলেন, "সংসারে বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তি আমার জীবনকে প্রস্তুত করিয়াছে, দুঃখ-শোকাদি বিপদের আঘাতে-আঘাতে আমার জীবন গঠিত হইয়াছে। আঘাতেই জীবন প্রস্তুত হয়। স্বর্ণকার সুবর্ণে বার বার হাতুড়ির আঘাত করিয়া উজ্জ্বল রত্নালঙ্কার প্রস্তুত করে। ভগবান্ দুঃখের আঘাতে মানুষের জীবন প্রস্তুত করেন। এজন্য শোক-দুঃখাদির নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ। আমার কার্য্যের দ্বারা কেহ যেন আমার বিচার না করেন, কারণ আমার বাহিরের কার্য্য আমার ভিতরের অবস্থার কথঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। দৈনিক জীবনের উত্থান-পতনের দ্বারা মানুষকে চিনিতে হয়, আমার দৈনিক জীবনই আমার পরিচয়ের প্রকৃত বস্তু। আমার জীবনে সামান্য যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, বাধাবিঘ্ন দুঃখ শোক প্রভৃতিই তাহার কারণ।"

একদা একটি ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আপনি তো অতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, সেখানকার সমাজ-সম্বন্ধে আপনি যতটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাতে আপনি পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষা আমাদের সমাজকে কোন্ বিষয়ে বিশেষভাবে হেয় মনে করেন?"

ব্রহ্মর্ষি উত্তর করিলেন,—"কোনো বিষয়েই নয়। বরং কোনো কোনো বিষয়ে ওদের সমাজ অপেক্ষা আমাদের সমাজ শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের ভাবের সমকক্ষ হ'তে ওদের অনেকদিন লাগবে। এর দ্বারা আমি একথা বলছিনে যে, ওদের ত্রিত্ববাদ আছে বলে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ওরা আদর্শ হ'তে নীচে আছে। আমাদেরও সেইরূপ পৌত্ত-লিকতা আছে। কিন্তু মোটের উপর ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা (Conception of God) ওদের চেয়ে উঁচু বলেই আমার মনে

হয়। ধর্ম্ম জিনিসটা আমাদের যেন অনেকটা অস্থিমজ্জাগত, আর ওদের নিকট ধর্ম্মটা যেন রবিবারের ব্যাপার। রবিবারে রাস্তায় বেরুলেই দেখা যায়, অসংখ্য নরনারী বালকবালিকা যেন পদ্মফুলের মতো সেজে-গুজে Churchএ যাচ্ছে, ঐ-দৃশ্য দেখে অবাক্ হ'তে হয়। কিন্তু রবিবার এবং সোমবারে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ! এক রবিবার প্রাতঃকালে Edinburghএ গিয়ে পৌঁছেই আমার মনে হ'ল সমস্ত সহরটা যেন প্রকাণ্ড একখানা ছবি। ইংলণ্ডের সকলস্থানেই রবিবারে Breakfastএর পর সমস্ত লোক সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে Churchএ যায়। কিন্তু অপর সকল বারে (week-days) ইংলণ্ড যেন ধর্ম্মশূন্য। আমাদের দেশে বাল্যকাল হতেই লোকের ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন। খেতে পরতে শুতে ধর্ম্ম। কিন্তু ওদের এই উন্নতির অবস্থাতেও ধর্ম্ম জাতীয় জীবনে এমনতরভাবে স্থান পায় নি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশ ক্রমশই উক্ত আদর্শ হ'তে নেমে পড়চে। ওদের দেশের পারিবারিক উপাসনা-প্রণালীটি বড়ই সুন্দর, সেটি আমাদের অনুকরণীয়। পরিবারের সকলেই এমন-কি চাকর-চাকরাণীরাও উপাসনায় যোগ দিয়া থাকে। উপাসনার পূর্ব্বে কোনো কাজই করা হয় না। পিয়ন চিঠির বাক্সে যে-সব চিঠি দিয়ে গিয়েছে, উপাসনার পূর্ব্বে তাও পড়া হয় না—পাছে মন চঞ্চল হয়। বিশেষ ভদ্রপরিবারেই কিন্তু এই প্রথা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে বাধ্যতা গুণটা খুবই আছে এবং এই গুণের জন্যই এরা এত বড় হ'তে পেরেছে। আমি একপরিবারে অতিথি হয়েছিলুম। একজন বিদেশীকে পেয়ে তাঁরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তথায় সন্ধ্যার পর সকলেই আমার সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা বলচেন এবং তাতে বিশেষ আমোদ উপভোগ করচেন, এমন সময়ে এক চাকরাণী এসে বল্লে, "Jane, it is 8 O'clock now"

ঐ-কথা শোনা মাত্রই একটি ছোট বালিকা বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় শুতে গেল। এই ঘটনাটির মধ্যে diciplime এবং obedience দুই-ই দেখা যায়। এবং এই দুই গুণের জন্যই ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। ধর্ম্মের প্রতি সকলেরই যে একটা কর্ত্তব্য আছে, ইংলণ্ডের লোক তা বেশ বুঝে। ধর্ম্মাচার্য্য কোনো বিষয় জ্ঞাপন করলে তারা তৎক্ষণাৎ সেইবিষয়ে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। একবার আমি দেখেছি, এক গরীব বৃদ্ধা আচার্য্যের আবেদন শুনে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পাঁচ শিলিং নিয়ে উপস্থিত হল! কি সুন্দর ভাব! এতে কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং বাধ্যতা দুই-ই প্রকাশ পাচ্ছে।"

ভৃত্যের প্রতি ব্রহ্মর্ষির ব্যবহার অত্যন্ত সুকোমল। ভৃত্যকে অবসর দিতে তিনি সর্ব্বদা প্রয়াসী। অকারণে বা সামান্য কারণে তিনি কখনই ভৃত্যের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করেন না। রাত্রিতে তাঁহার প্রয়োজনীয় সকল জিনিসই তাঁহার সম্মুখস্থ কাষ্ঠাসনে সংগৃহীত থাকে, সমস্তই যথাসময়ে ব্যবহৃত হয়, ভৃত্যের কোনো প্রয়োজন থাকে না। দিবসেও প্রায় তদ্রূপ। তিনি তাঁহার ভৃত্যকে দিবসে ও রাত্রে নিদ্রা যাইতে উপদেশ দেন। এমন ভৃত্যভক্ত প্রভু জগতে কয়জন মিলে?

"ব্রহ্মর্ষির কোনোসময়েই বৃদ্ধোচিত নিদ্রাতুর ভাব নাই। তিনি যেন নিত্যজাগ্রত পুরুষের সঙ্গলাভে একেবারে বিনিদ্র ইহয়া পড়িয়াছেন।"

"ব্রহ্মর্ষি নিত্য পথ্যাশী। তাঁহার চিকিৎসা সুপথ্যপালন। এমন সংযত পানাহার তো বড় দেখিতে পাই না। তিনি একেবারে স্বাবলম্বী, স্বাধীন, সুস্থ, স্বভাবে নির্ভরশীল—ঈশ্বর-বিশ্বাসী। তিনি কোনোদিন কোনোরূপ ঔষধ সেবন করেন না, কেবল সুপথ্যেই আরোগ্যলাভ করেন। মর্দ্দনের তৈলটিকে পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত করিয়া নিত্য

ব্যবহারের বস্তু-মধ্যে ঔষধরূপে স্থান দিয়াছেন। তিনি কোনোরূপ অসুস্থতা বোধ করিলে তজ্জন্য কাহাকেও ব্যস্ত করেন না। নীরবে উহাকে ঈশ্বরের দান বলিয়া মানিয়া লন, এবং চিন্তা ও প্রার্থনা দ্বারা সেই অসুস্থতা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন করেন। ব্রহ্মসাধকের সাধনা যেন সর্ব্বতোমুখী। বিশেষ অসুস্থ থাকিলেও কোনোদিন কেহ তাঁহাকে অসহিষ্ণু বা অসন্তুষ্ট দেখিতে পায় না। তিনি নিত্য প্রশান্ত।"

"মানুষকে—কোনো মানুষকেই ব্রহ্মর্ষি কোনো বিশেষ কর্ম্মে একেবারে অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। তিনি মনে করেন, সকলেই ব্রহ্মশিশু, শক্তির উদ্বোধন সাধন করিলে সকলের দ্বারাই সকল কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে। বাস্তবিক তিনি এই ধারণার অনুসরণ করিয়া অনেক নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা মহৎ মহৎ শিক্ষিতের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া লইতেছেন। বহুতর অনভিজ্ঞকে অভিজ্ঞ করিয়া দেবালয়ের উপাসনার রত্ন-বেদীতে আচার্য্যের আসনে বসাইয়াছেন। মানুষের মধ্যে কি-শক্তি তিনি দেখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। সৃষ্টি ছাড়িয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে তিনি দেখিতে পান না, এই কথাই তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির ভিতর, সৃষ্টজীবের মধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ দর্শন করিয়া যিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর, তাঁহার মর্ম্মমুদ্রা কাহারো মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নহেন, ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মর্ষি। বিশ্বমানবের প্রাণ-মন্দিরে তিনি সত্য সত্যই ব্রহ্মকে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি কখনো কোনো মানবের নিন্দা বা কুৎসা করেন না; বরং সকলের কল্যাণের জন্য চেষ্টা ও প্রার্থনা করেন। জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মজ্ঞানে তাঁহার চক্ষে কেহই ছোট নহে। কতদিন তিনি কাঙালীর দলে কাঙালী, নীচের দলে নীচ সাজিয়া সঙ্গ এবং সহভোজনে প্রেমদান করিয়াছেন।"

"বালক বালিকাদের জীবনে ব্রহ্মর্ষি যে কি-সুধা আস্বাদন করেন, কোন্ ভবিষ্যতের স্বর্গ দেখিতে পান তাহা তিনিই জানেন। বালক-বালিকা মাত্রকেই তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাহাদিগকে আশা, উৎসাহ শিক্ষা সাহস উপদেশ এবং সন্দেশ প্রভৃতি যখন যাহার যাহা আবশ্যক তাহা দিয়া থাকেন। আত্মপর-নির্ব্বিশেষে সকল বালকেই ব্রহ্মর্ষি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় মাদক দ্রব্য ব্যবহার এবং বিক্রয় নিষেধের রাজকীয় আদেশ প্রচারিত হইয়াছে শুনিয়া ব্রহ্মর্ষির কি আনন্দ—তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এইবার আমার চিরদিনের চেষ্টা ফলবতী হ'ল, এইবার বালকগণের প্রাণরক্ষা হ'ল। আজ ছেলেদের নিমন্ত্রণ করে লেবু ও সন্দেশ দিতে হবে।' কার্য্যেও ঠিক তাহাই হইল। তিনি সমাজ-পাড়ার বালকগণকে দেবালয়-গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সাদরে তাহাদিগকে সন্দেশ ও কমলালেবু খাইতে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কত সুমধুর উপদেশ প্রদান করিলেন। কি আশ্চর্য্য শিশু-প্রীতি!"

উপায়-উদ্ভাবনী শক্তি ব্রহ্মর্ষির এক স্বাভাবিক সম্পদ। কি শিল্পে, কি গৃহকর্ম্মে, কি অপর কোনো বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি অতুলনীয়। তিনি অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি। বাক্যে ব্যবহারে সাংসারিক ব্যাপারে সকলেই তাঁহার অসংখ্য পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি যে-তৈলটি ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহার স্বকল্পিত উপায়সিদ্ধ। তাঁহার ডেস্ক, আলমারী, গ্রন্থরক্ষার অন্যান্য কাষ্ঠাধার, সংবাদপত্রের আবশ্যক অংশ কর্ত্তন করিয়া সযত্নে রক্ষার ব্যবস্থাদি, এ সমস্তের মধ্যেই ঐ-উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বিদ্যমান। তিনি শুধু ধর্ম্ম-গুরু কর্ম্মবীর সমাজ-সংস্কারক নহেন। তিনি তন্তুবায় সূত্রধর স্বর্ণকার কর্ম্মকার কৃষক বণিক প্রভৃতি সকলেরই শিক্ষক। তিনি ময়রার মিষ্টান্ন-

পাক-শিক্ষার শিক্ষাগুরু, গৃহিণীগণের গৃহস্থালী-শিক্ষার সুনিপুণ উপদেষ্টা। তাঁহার স্বকল্পিত একটি কোষ্ঠ-শোধক মোদক আছে, তিনি উহার নাম রাখিয়াছেন "দেবপ্রসাদ"। সত্য-সত্যই ব্রহ্মর্ষিতে যেন সর্ব্বপ্রকার দেবপ্রসাদ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে।"

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বেদান্তভূষণ কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয় ব্রহ্মর্ষি শশিপদ-সম্বন্ধে স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি দেবালয়ে বাসা লই বিপদে পড়িয়া। যখন সাধনাশ্রমে বাস করি, একাকী থাকি, ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত পান-ভোজন এবং ধর্ম্মানুশীলন করি। আমার পত্নী এবং কন্যা-পুত্রগণ স্থানান্তরে থাকিত। পত্নীর সুকঠিন পীড়ায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন যেমন হইল, আনাও হইল; স্থানান্তরে একটি পরমাত্মীয়ের বাটীতে রাখা হইল। কিন্তু সেখান হইতে চিকিৎসাদির বড় সুবিধা হইল না। দীন, সাধনার্থী অর্থ কোথায় যে বাড়িভাড়া করিয়া পত্নীকে রাখিবার ব্যবস্থা করি। অনুপায়! এমনসময়ে সেবাব্রত ব্রহ্মর্ষি শশিপদ আমার দুঃখের কথা শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ানন্দের আনন্দ-রাজ্যে পরদুঃখে বড় বেদনা হয়, বেদনা হইল। তিনি আমাকে ডাকিয়া তাঁহার গৃহকক্ষে স্থান দিয়া সকল প্রয়োজনীয় যোগাইয়া দিলেন। মহত্ত্ব দেখিয়া অবাক্। এ তো বড় সহজ গুণ নহে। কে আমি অজ্ঞাত কুলশীল নিঃসম্বন্ধ মানব, কে তিনি মহান্, এ কি দয়া! এ কি সহানুভূতি।"

"আমি দেবালয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম বড় তাঁহার কাছে যাইতাম না। তাঁহার একাকীত্ব, ধ্যানশীলতা, অনন্যকর্ম্মতা প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবগুলি চিন্তা করিয়া কিছু দূরে দূরে থাকিতাম। তাঁহার সাধন-

বিমলীকৃত স্বচ্ছ চিত্তে কেমন করিয়া আমার ভাব প্রতিভাসিত হইল, জানিনা। হঠাৎ একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমি আপনার কক্ষে শয়ান, দ্বার-বহির্ভাগ হইতে তাঁহার ভৃত্য আমাকে ডাকিল,—'বাবু, বড় বাবু আপকো বোলাওয়ে'। শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহার কক্ষে গমন করিলাম। ভাবিলাম, একি—সেবাব্রত ব্রহ্মর্ষি কি তবে সর্ব্বজ্ঞ—পরচিত্তের গূঢ় সংবাদ তবে কি তিনি জানিতে পারেন! ঠিক তাই। এমন কত দিনের ঘটনায় আমি যে-দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। একি দৈব শক্তি নয়?"

"যখন সে-রাত্রিতে সেবাব্রতের গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলাম, তখন দেখি, তিনি পরদিনের ভাবী ব্যঞ্জনের আয়োজনে রহিয়াছেন। ছুরিকা-হস্তে কতকগুলি বনজের ছেদন-খণ্ডনে নিয়োজিত। সযত্নে পরদিনের তরকারির যোগাড় করিতেছেন। নিকটে ভৃত্য বর্ত্তমান, অথচ এ কি? তাহার মধ্যেও সেই সানন্দতা এবং কর্ম্মে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের মহদ্ ভাব। ভাবিলাম, তরকারিকোটাও কি ব্রহ্মর্ষির ব্রহ্মসাধনের অঙ্গ? মনে মনেই সিদ্ধান্ত করিলাম, নয় কেন? সকল কর্ম্মে সকল জ্ঞানে সমস্ত প্রেমে সুতরাং সর্ব্বকালীন, সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপাত্রীয় সকল ক্ষেত্রেই ত ব্রহ্ম অবতীর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সিদ্ধান্ত হইল, ইনি কর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মলাভের বিচিত্র তীর্থপথের যাত্রী বটেন। সে-রাত্রে ব্রহ্মর্ষির কাছে বসিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের যে-সকল উপদেশ, তাঁহার মৌনমুখর ভাবোজ্জ্বল জ্ঞান-দীপ্ত মূর্ত্তির নিকট লাভ করিয়াছি, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে।"

ব্রহ্মর্ষি বলেন,—"একসময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রণাম করিবার প্রথা ছিল না। এমন-কি কেশব বাবুকে প্রণাম করাতে ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক ঘটনারূপে

লিপিবদ্ধ হইয়াছে।" ব্রহ্মর্ষিই প্রথম তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে প্রণাম করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে হিন্দুপরিবারে মিশিবার সুযোগ দিতেন। কারণ তাহা হইলে উহারা হিন্দুদিগের রীতি নীতি, গুরুজনে ভক্তি, মাননীয়দিগের সংবর্দ্ধনাদি শিক্ষা করিতে পারিবে। তখনকার দিনে ঐ-সকল গুণ ব্রাহ্মসমাজে বড় দেখা যাইত না। ব্রহ্মর্ষি বাড়িতে যেসকল উপদেশ দিতেন, তাহা তাঁহার কন্যাদিগকে লিখিয়া লইতে হইত। মন্দিরে যাইবার সময় তিনি কন্যাদিগকে কাগজ ও পেন্সিল লইয়া যাইতে বলিতেন। তদনুসারে উপদেশ লিখিয়া লইবার জন্য তাহারা কাগজ পেন্সিল লইয়া সমাজে যাইত।

কাশীপুরে মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে এক উদারচেতা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। কাশীপুর কাশীনাথ ইস্কুলের সত্বাধিকারী হইয়া কয়েক বৎসর তিনি বেশ প্রশংসার সহিত উক্ত ইস্কুল পরিচালন করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত মহিম বাবুর বিশেষ যোগ ছিল। পরে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের দলে মিশিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরমহংসের শিষ্যত্ব বা চেলাত্ব স্বীকার করেন নাই। শেষে প্রৌঢ় বয়সে তান্ত্রিক অবধূতের শিষ্য হইয়া নকুলাবধূত নাম গ্রহণ করিয়া অবধূত সাধক হইয়াছিলেন। প্রথম বয়স হইতেই ব্রহ্মর্ষি শশিপদর সহিত তাঁহার আনুগত্য ছিল। ব্রহ্মর্ষির যাবতীয় সৎকার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তান্ত্রিক সাধক হইবার পর হইতেই হিন্দু, ব্রাহ্ম, পরমহংস প্রভৃতি সকল দলের অনেক লোকই মহিমবাবুর প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। সেইসময়ে ব্রহ্মর্ষি একদিন মহিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহাকে মহিম বাবুর নিকট যাইতে নিষেধ করেন। ব্রহ্মর্ষি

কিন্তু-ঐ নিষেধ না শুনিয়া একাকী একদিন মহিম বাবুর বাটীতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। ব্রহ্মর্ষি যখন মহিম বাবুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে ভগবৎ কথা উত্থাপন করিলেন, তখন মহিম বাবুর দুইচক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মর্ষির মনে পূর্ব্বশ্রুত নিন্দাবাদে বিশ্বাস দূরীভূত হইয়া শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে সন্ন্যাসবেশী মহিম বাবু একদিন বৈকালে ব্রহ্মর্ষির বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তার পর ব্রহ্মর্ষি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা বনলতাকে ডাকিয়া মহিম বাবুর সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দেন। মহিম বাবু বনলতার মুখে তাহার রচিত "ধুতুরা" শীর্ষক একটি পদ্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মর্ষির বাগানের সাম্‌নেই ধুতুরা ফুলের একটি গাছ ছিল। তাহাতে একটি ফুল ফুটিয়াছিল। তাহা দেখিয়াই ঐ পদ্যটি লিখিত হয়। কবিতা-রচনায় বনলতার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া তিনি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং বনলতাকে একখানি বৃহৎ লাল দর্পণ উপহার দিবেন বলিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর দিনই সেই দর্পণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপদেষ্টার বাক্যে, পুস্তকে ও সঙ্গীতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। কিন্তু তদনুসারে চলা বড়ই কঠিন। উপদেশ দেওয়া অতি সহজ, পুস্তক বা গান রচনাও তাদৃশ কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু কার্য্যে তাহা পালন করাই দুষ্কর। একটি ব্রহ্মসংগীতে এই পদটি আছে—"বিপদ সম্পদ তব পদলাভে।" এ-কথাটির অর্থ খুব সোজা, কিন্তু ভাব অতি গভীর। তাঁহার পদ দর্শন বিনা বিপদকে সম্পদরূপে কেহই গ্রহণ করিতে পারে না। বিপদ যাঁহার নিকট সম্পদরূপে প্রতীয়মান হয়, তিনি তো মহাযোগী। তিনি দ্বন্দ্বাতীত মহাপুরুষ। বিপদে বিহ্বল এবং অধীর হন না এরূপ লোক অতি বিরল। ভগবানে যাঁহার একান্ত বিশ্বাস,

ব্রহ্মকৃপালাভের জন্য যাঁহার প্রবল আকাজ্ক্ষা, তিনি কখনো বিপদে অধীর হন না। তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া "বিপদ সম্পদ তব পদলাভে" এই কথা বলিয়া আশস্ত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদ অনেক বিপদে পতিত হইয়াছেন। সেই বিপদের সময়ে তাঁহার শান্তভাব, ধৈর্য্য ও কার্য্যকারিতা প্রভৃতি নানাবিধ বিপদের বিবরণ বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন লেখক-কর্তৃক বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকেও কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ঐ-সকল সদ্গুণ তাঁহার পরিবারের মধ্যে অতি গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় না হইলেও অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মর্ষির বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন এবং ভগবৎনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার কন্যারা বিপদের সময়ে যেরূপ ধীর ও শান্তভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও অনেকের শিক্ষাপ্রদ। সহস্র উপদেশে যাহা না হয় একটি সত্য দৃষ্টান্তে তাহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা হয়। আবার প্রত্যক্ষ চরিত্র-দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও স্থায়ীরূপে শিক্ষা দান করে। ব্রহ্মর্ষির পরিবারবর্গ বহুদিন ধরিয়া তাঁহার চরিত্র দেখিতেছেন। রোগে শোকে এবং সাংসারিক অন্যান্য দুঃখ-কষ্টে তাঁহার অবিকৃত ভাব ও ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস দেখিয়া দেখিয়া পরিবারবর্গও সাংসারিক বিপদে আশ্বস্ত হইতে শিখিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন। স্ত্রীপুত্রাদির শোকেও তিনি অধীর হন নাই। উপযুক্ত পুত্রবিয়োগে যাঁহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মর্ষির মুখ হইতে সান্ত্বনার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সেও তিনি কয়েকটি উপযুক্ত কন্যার মৃত্যুতে নিদারুণ শোক পাইয়াছেন। তাঁহার আজন্মলালিত স্বহস্তে-গঠিত স্নেহাস্পদ কন্যার বিয়োগেও

তিনি অধীর হন নাই। ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অটল বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয় তাঁহার এইসকল অবিচলিত ভাব স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তরেও তাহা সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐ-সকল বিপদের কিছুদিন পরে একদিন ব্রহ্মর্ষি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়কে (সুদেবী এবং শান্তি) সঙ্গে লইয়া মদন মিত্রের গলিস্থ বাসভবন হইতে পদব্রজে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সেই ব্রাহ্মবন্ধুটি ব্রহ্মর্ষির বিপদের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সহিত দেখা হওয়াতে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষি তাঁহার কথা শুনিয়া শান্ত ও গম্ভীরভাবে শুধু এই কথা বলিলেন—"বিপদ সম্পদ তব পদলাভে।" এই বলিয়া তিনি মন্দিরে চলিয়া গেলেন। কন্যাদ্বয় পিতার সেই সময়কার ভাব স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, এবং তাঁহার ঐ উত্তরও শুনিলেন। উহা দর্শন ও শ্রবণের ফল অল্পদিন পরেই তাঁহাদের জীবনে কেমন ফলিয়াছিল তাহাই বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই ব্রহ্মর্ষির কন্যা সুদেবী বিবাহিতা হইয়া স্বামীর সহিত আসাম প্রদেশের ধুবড়ি নগরে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। তাহার কিছুদিন পরেই সংবাদ আসিল যে "চোরে সিঁদ দিয়া সুদেবীর শয়ন-গৃহের সমস্ত দ্রব্যাই চুরি করিয়াছে। তাঁহার বিবাহের যৌতুক এবং অলঙ্কারাদি লইয়া প্রায় একহাজার টাকার জিনিস চুরি গিয়াছে।" ব্রহ্মর্ষি এই সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্রও অধীর হইলেন না। কন্যার জন্য নূতন বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিলেন। শুনা গেল, সুদেবীর শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনেরা এই বিপৎপাতে নিতান্ত অধীর হইয়াছিলেন। বিপদও যেমন-তেমন নয়—সর্ব্বস্বনাশ! কিন্তু সুদেবী সে-

সময়ে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বিবাহের উৎকৃষ্ট উপহারের বস্ত্রসকল, মূল্যবান অলঙ্কার সমুদয় অপহৃত হইল, তথাপি সেই বালিকা-বয়সেও তিনি কাঁদিলেন না বা অধীর হইলেন না। এদিকে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শান্তি তাঁহাকে একপত্র লিখিলেন, তাহাতে এই সান্ত্বনার কথা লেখা ছিল,—"দিদি সেই একদিন রাস্তায় যাইতে যাইতে বাবা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ মনে আছে, 'বিপদ সম্পদ তব পদলাভে', বোধ হয় সে-কথা তোমারও মনে আছে। আশা করি তুমি ঐ-কথা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইবে।" ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পিতৃগুণ কন্যাতে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মর্ষি যেমন দেশহিতকর অন্যান্য সংস্কার-কার্য্যে চেষ্টা, উৎসাহ ও পরিশ্রমদ্বারা সফলতা লাভ করিয়াছেন, বঙ্গভাষার সংস্কার ও উন্নতির জন্যও সেইরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ, অদম্য উদ্যম এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। যদিও তিনি সুলেখক ও সুবক্তা নহেন, তথাপি তিনি দীন মাতৃভাষার উন্নতির জন্য তাঁহার সমগ্র মানসিক শক্তি, শারীরিক সামর্থ্য এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। 'বরাহনগর সমাচার' নামক সাপ্তাহিক পত্র তাঁহারই সম্পাদনে প্রকাশিত হইত। 'শ্রমজীবী' নামক বিখ্যাত মাসিকপত্র তাঁহারই প্রতিভা ও পরিশ্রমের পরিচায়ক ছিল। ঐ-পত্রে তাঁহার রচিত অনেক লেখা বাহির হইত। এখানে তাঁহার রচিত একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "শ্রম নামে কল্পতরু অতি চমৎকার, যাহা চাই তাহা পাই চরণে তাহার।" এই রচনায় ভাষা ও শিক্ষা উভয়েরই গভীরতা আছে। এইপ্রকার অনেক লেখা 'শ্রমজীবী' পত্রে প্রকাশিত হইত। ভক্তিভাজন পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।

ব্রহ্মর্ষি তাঁহার কয়েকটি কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা বাংলা ভাষায় সুশিক্ষিতা করাইয়াছিলেন। 'অন্তঃপুর' নামক মাসিক পত্রের তিনিই উদ্ভাবক। তাঁহারই যত্নে ও পরামর্শে তাঁহার কন্যা উষাবালা এবং বনলতা কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত হইত। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এবং পরামর্শে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শান্তিময়ীর সম্পাদনে 'গৃহলক্ষ্মী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে বালক-বালিকা-দিগের জন্য তিনিই প্রথমে সঙ্গীত রচনা করেন। তৎপূর্ব্বে বালক-বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র গান ছিল না। ব্রহ্মর্ষি শশিপদই তাহার প্রথম রচয়িতা। বাংলা ভাষা শিক্ষাদিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার ইস্কুল স্থাপন করিয়াছেন। শ্রমজীবিদিগের জন্য নৈশ-বিদ্যালয়, রবিবাসরীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাদ্বারা তিনি বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিস্তৃতির সাহায্য করিয়াছেন। তিনি নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রণালীর নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি বাংলা বর্ণমালা হইতে 'শ' ও 'ন' এর স্বাতন্ত্র্য উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭০ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখের হিন্দুপেট্রিয়েট নামক সংবাদপত্রে তাঁহার এই চেষ্টার বিষয় লিখিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ 'শ' ও 'ন' এর একত্ব বিধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভাষাকে সহজ সুবোধ্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। মাতৃভাষার উন্নতিই জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক একথা বলাই বাহুল্য।

যৌবনের প্রারম্ভে ব্রহ্মর্ষির কার্য্যকলাপে যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল, এখনো এই বার্দ্ধক্যে তাহা সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস এবং অকপট প্রার্থনা। বিশ্বাস ও প্রার্থনা যেমন প্রথম বয়সে ব্রহ্মর্ষির সহায় হইয়াছিল, এখনো সেই বিশ্বাস এবং প্রার্থনাই তাঁহার অবলম্বন। সেই

বিশ্বাস ও প্রার্থনার বল অমোঘ অক্ষয় ও নিত্য নবীভূত। তিনি বলেন, 'ভগবানের নিকট হইতে তাঁহার যে-কৃপার স্রোত আসে, তাহা কখনো শুকায় না।' তিনি আরো বলেন, 'ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমিও তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিয়াছি। প্রথম বয়সে যে-প্রার্থনাকে ধরিয়াছি, তাহা একদিনের জন্যও ছাড়িতে পারি নাই। যে-আনন্দময়ের আনন্দময় নামে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই নামকে জীবনের সার করিয়া রহিয়াছি। তিনিও আমার সহায় হইয়া আছেন। জীবনের সকল শোক তাপ ও পারিবারিক দুর্ঘটনাতে তিনিই আমার সহায় হইয়া আছেন। আমি কখনো তাঁহার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হই নাই। এই জন্যই আমি সময় সময় বলিয়া থাকি,—'আমার কপালে দুঃখ নাই।''

যে-সকল লোক ব্রহ্মর্ষির প্রতি নির্য্যাতন ও উৎপীড়নের একশেষ করিয়াছে ব্রহ্মর্ষি বরাবরই তাহাদের উপকার করিয়াছেন। ইহার বহু দৃষ্টান্ত বিবিধ পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। এক ব্রাহ্মণ-যুবক দেশে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ও বাগ্মী, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার আর্থিক অবস্থা বড় খারাপ। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তদানিন্তন কোনো প্রসিদ্ধ প্রচারকের আত্মীয়। তাঁহার কথা শুনিয়া ব্রহ্মর্ষি শশিপদ একদিন দেবালয়ে বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য ব্রাহ্মদিগের নিকট অনুরোধ করেন। তাহাতে কেহ কেহ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এইসময়ে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসেন। এবং মাঝে মাঝে দেবালয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশ তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষিও

তাঁহার উপকার সাধনে তৎপর হইলেন। উক্ত ব্রাহ্মযুবক ইতিপূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ও উপবীতত্যাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় কাহারো নিকট হইতে তেমন কিছু সাহায্য পান নাই। ক্রমে দেবালয়ের কার্য্য দ্বারা তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি প্রচারিত হইতে লাগিল। যখন তিনি প্রচার-কার্য্যে নিপুণ বলিয়া পরিচিত হইলেন, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে প্রচারকের কার্য্যের সহায়ক করিয়া লইলেন। তখন আর তিনি দেবালয়ের কার্য্যে যোগ দেন না। বরং দেবালয়ের নিন্দাই করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু ঐ-দেবালয়ই তাঁহাকে কলিকাতায় স্থাপিত করিয়া সকলের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। একদিন তিনি থাকিবার আশ্রয়ের জন্য বিপন্ন হইয়া দেবালয়-প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মর্ষি শশিপদর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। যে-বাড়িতে তিনি ছিলেন, সেই বাড়ির কর্ত্তা তাঁহাকে উঠাইয়া দিতেছেন। কোথাও তিনি ঘর পাইতেছেন না। তিনদিন পরে একটি বাড়ি খালি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান গৃহস্বামী আর একদিনও অপেক্ষা করিবেন না। স্ত্রী-পুত্র লইয়া তিনি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত, কোথাও একটু আশ্রয় পাইতেছেন না। এইসমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মর্ষির করুণ হৃদয় আর্দ্র হইল। কিন্তু তখন তাঁহার এমন একটিও ঘর খালি ছিল না যে তাঁহাদিগকে থাকিতে দেন। তখন তিনি তাঁহার নিজের আবাস-গৃহে তাঁহাদিগকে থাকিতে দিয়া নিজে একটি টিনের ছাদ-বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সেটি বাসগৃহ নহে, তাহার দৈর্ঘ্য আড়াই হাত এবং প্রস্থ দুই হাত। তাহার মধ্যে একজন মানুষ শয়ন করিতে পারে না। তথাপি পরদুঃখ-কাতর সেবাব্রত শশিপদ সেইঘরে বাস করিয়াছিলেন। এ-হেন উপকারী ব্যক্তির প্রতিও পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম যুবক যথেষ্ট বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি তাহাতে কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই। তিনি

বন্ধুর ন্যায়—আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহাদের সংবাদাদি লইতেন। ক্রোধ মানুষের সহজাত রিপু। এই ক্রোধোৎপত্তির যতগুলি কারণ আছে, উপকারীর প্রতি কৃতঘ্নতাচরণ তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ। ইহাতে অতি শীতল শোণিতও উষ্ণ হইয়া উঠে। অতি ধীর শান্তপ্রকৃতিরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। এইপ্রকার কৃতঘ্নের প্রতি ক্রোধ উপশমিত করিয়া যাঁহারা আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার করিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।

একদা কৃষ্ণনগরের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক কোনো ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে কিছু টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে দেবালয়েও পাঁচটাকা দান করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে উক্ত কৃষ্ণনগরে অন্য এক পরিবারে কোনো অনুষ্ঠান-উপলক্ষে তাঁহারা কিছু দান করিবেন বলিয়া জনরব উঠে। সেই সময়েই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মযুবক কৃষ্ণনগরের উক্ত অনুষ্ঠান-কর্ত্তাকে একখানি পত্র লেখেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে, "দেবালয়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোনো সংস্রব নাই, দেবালয়ে কিছু দান করিবার আবশ্যক নাই।" ইত্যাদি। সেই চিঠিখানি বাবু ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নয়নগোচর হয়। ঐ পত্র পড়িয়া তিনি ঐ ঘটনা ব্রহ্মর্ষিকে আসিয়া বলেন। উহা শুনিয়া ব্রহ্মর্ষি বিস্মিত হইলেন। ঐ ব্রাহ্মযুবকের কৃতঘ্নতায় আমরাও বিস্মিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্মর্ষি প্রথম হইতে যত সৎকার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কোনো কার্য্যেই ব্রাহ্মসমাজের তেমন সহানুভূতি পান নাই; বরং কোনো কোনো কার্য্যে অনেক বাধা পাইয়াছেন। অথচ তিনি একজন অগ্রগামী ব্রাহ্ম। তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং ব্রাহ্ম-মতের সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কারক ব্রাহ্মসমাজে বিরল।

বরাহনগরে হরিচরণ মাইতি নামক একব্যক্তির অবস্থা একসময়ে

ভালই ছিল। পরে তাহার অবস্থা খারাপ হওয়ায় সে উমেশচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তির নিকট নিজ বসত-বাড়ী বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করে। কিন্তু ঐ টাকা দিতে না পারিয়া হরিচরণ ব্রহ্মর্ষি শশিপদর শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মর্ষি তাহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন। সেই সময়ে হরিচরণ তাহার বসত-বাটীর অর্দ্ধাংশ ব্রহ্মর্ষির নিকট বন্ধক রাখিয়া দুই হাজার চারিশত টাকা কর্জ্জ লইয়া পূর্ব্বোক্ত মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে স্ত্রী ও দুইটি না-বালক সন্তান রাখিয়া হরিচরণ পরলোক গমন করে। তাহাদের ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো উপায়ই ছিল না। এক দিন হরিচরণের স্ত্রীকে ডাকাইয়া ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,— 'আমার টাকা শোধ কর্‌বার তোমাদের তো অন্য কোন উপায় নেই, এক-মাত্র উপায় বাড়ী বিক্রয় করা। তাতে দেনা শোধ হয়ে তোমাদের হাতেও কিছু থাক্‌বে। আমি একপয়সাও সুদ নেবো না।' দুষ্ট লোকে বিধবাকে বাড়ী বিক্রয় করিতে নিষেধ করিল। তাহারা বুঝাইল যে, "তোমার ছেলে না-বালক, শশিপদ বাবু টাকা আদায় কর্‌তে পার্‌বেন না।" হরি-চরণের স্ত্রী দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া বাড়ী বিক্রয় করিল না। তখন অগত্যা ব্রহ্মর্ষি নালিশ করিয়া ঐ বাড়ী নিজে খরিদ করিতে বাধ্য হইলেন এবং বাটোয়ারা নালিশের দ্বারা নিজ অর্দ্ধাংশের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। অপর অর্দ্ধাংশ হরিচরণের বড় ভাইএর। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলেই অধিকারী। সে অত্যন্ত অসচ্চরিত্র এবং মদ্যপায়ী। সে ব্রহ্মর্ষির অধিকৃত বাটী ভাঙ্গিয়া কাঠ-কাঠ্‌রা চুরি করিতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষি তখন কলিকাতায় ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পতিত। তিনি ঐ সংবাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইয়া হরিচরণের ভ্রাতুষ্পুত্রকে ঐরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। তাহার নাম ক্ষীরোদ মাইতি। কিন্তু সে তাহাতে দৃক্‌পাতও করিল না। সে আরো বেশী

করিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। সে ঐ বাড়ী ভাঙ্গিয়া চূরমার করিল, ইট্ কাঠ সব চুরি করিল। অবশেষে ব্রহ্মর্ষি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। উহার অর্থদণ্ড হইল। নিজের সম্পত্তি অন্যে কাড়িয়া লইতেছে, এমতাবস্থায় সেই চোরকে কখনই ক্ষমা করা উচিত নয়। শক্তি থাকিলে তাহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ অপেক্ষা, সেই মাইতি সর্ব্বাংশে দুর্ব্বল ; কিন্তু তথাপি ব্রহ্মর্ষি নিজে তাহাকে শাস্তি দেন নাই। নিষেধ করিয়াছিলেন মাত্র। পরে সেই বাটী ব্রহ্মর্ষি বরাহনগর শশিপদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্‌কে দান করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে ইন্‌ষ্টিটিউটের ট্রাষ্টীগণ সেই বরাহনগর আলমবাজারের জমি বিক্রয় করিয়া Instituteএর স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে সেই টাকা জমা রাখিয়াছেন। এত কষ্ট ও এত বাধা-বিপত্তির হস্ত হইতে ব্রহ্মর্ষি যে সম্পত্তি লাভ করিলেন, সেই সম্পত্তি তিনি জনসাধারণের হিতের জন্য দান করেলেন। আর যে লোক তাঁহার প্রতি এত অন্যায় অত্যাচার করিল, তাহাকে তিনি শাস্তি দিতে সম্মত হইলেন না এবং পরে সেই ক্ষীরোদ মাইতিকে তিনি বহু সাহায্য করিয়াছেন। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, প্রণীত "কর্ম্ম ব্রহ্ম" নামক পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত পরীক্ষা। এইরূপ অবস্থায় ক্রোধের পরিবর্ত্তে চিত্তসংযমের দ্বারা ক্ষমার বশীভূত হওয়া বড়ই কঠিন। ব্রহ্মর্ষি এইরূপ কত কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিত্র ও ধর্ম্ম সুগঠিত করিয়াছেন।

অনেক দিন হইতেই প্রার্থনাকালে ব্রহ্মর্ষির মনের ভাব এই ছিল যে, "আমায় কাঙাল কর।" দেওঘরে একবার এক ফকির ভিক্ষা করিতে আসিয়া তাঁহাকে 'আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল যে, 'তুমি রাজা হও। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মর্ষি বলিয়াছিলেন, "আমি রাজা হতে চাইনে, আমায়

'ফকির হও' বলে আশীর্ব্বাদ কর।" এখন তাঁহার সেই বাসনা সম্পূর্ণ-রূপেই পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যথাসর্ব্বস্ব ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। অনেকগুলি পুত্র-কন্যা এবং দুইটি স্ত্রীকে স্বয়ং ভগবান্ ডাকিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজকার্য্যানুরোধে বহুদূরে থাকেন। কন্যাটি শ্বশুরালয়ে; সুতরাং তাঁহার গৃহ একেবারেই শূন্য। লোকশূন্য হইলেই যে গৃহ শূন্য হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই ব্রহ্মর্ষি কলিকাতার বসত-বাড়ী 'দেবালয়' নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অন্যান্য দানের অবশিষ্ট যাহা কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল, তাহার সহিত দেবালয় ট্রাষ্ট-ডীড্ পত্র রেজেষ্ট্রী করাইয়া ট্রাষ্টীদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মর্ষি পূর্ব্ব হইতেই ঐ বাটীর চৌতালায় বাস করিতেন। ট্রাষ্ট-ডীড্ পত্রখানি লিখিবার সময়েও তাঁহার মনে ছিল যে, তিনি জীবনের শেষ কয়দিন ঐ চৌতালাতেই বাস করিবেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। ১৯০৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ব্রহ্মর্ষির জন্মদিনে 'দেবালয়ে'র ট্রাষ্টীদিগের এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটি অধিবেশন হয়। সেই সময়ে ব্রহ্মর্ষি ট্রাষ্ট-ডীড্ পত্র প্রভৃতি ট্রাষ্টীদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার গৃহস্বত্ব লোপ পাইল। তিনি এখন একজন ট্রাষ্টীমাত্র। তিনি তখন মনে করিলেন, এ গৃহ তো এখন আর আমার নয়, চৌতালায় বাস করিবার অধিকার আর আমার নাই; থাকিতে হইলে, আমার রীতিমত ভাড়া দেওয়া উচিত। অত ভাড়া দেওয়ার আমার প্রয়োজন কি? উপযুক্ত ভাড়ায় অন্য ভাড়াটেকে দিলে দেবালয়ের আয় হইতে পারে। এই স্থির করিয়া তিনি সেই দিন হইতেই চৌতালা পরিত্যাগ করিয়া নিম্নতলে আসিয়া বাস করিলেন। সেই দিন হইতেই তিনি সংসারত্যাগী তীর্থাশ্রমীর ন্যায় বাস

করিতেছেন। এতদিন পরে ভগবান্ তাঁহাকে সত্য সত্যই কাঙাল করিয়াছেন।

১৯১১ সালে *ব্রহ্মর্ষির সুযোগ্য পুত্র মিঃ অ্যালবিয়ান্ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (I. C. S., C. I. E.) ভ্রমণের জন্য পিতাকে একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ি ও একটি ঘোড়া কিনিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এক পত্র লেখেন। ইহাতে যে পুত্রের পিতৃভক্তি সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি—যিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া কাঙালের কাঙাল হইবার জন্য সাধনা করিতেছেন এবং সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কিরূপে ঐ গাড়ি ঘোড়া গ্রহণ করিবেন? প্রত্যুত্তরে তিনি পুত্রকে গাড়ি ঘোড়া দিতে নিষেধ করিলেন। ইহাদ্বারা ব্রহ্মর্ষির সেই প্রার্থনা "আমায় কাঙালের কাঙাল কর" কেমন সফল রাখিয়াছেন এবং অন্তরে সেই সাধনাই কেমন রক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

"ব্রহ্মর্ষি চিরদিনই কর্ত্তব্যে স্থির। কোনো প্রকার বাধা-বিঘ্ন কখনই তাঁহাকে তাঁহার সংকল্পিত কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। শত্রুতা বা বিপক্ষতায় তিনি স্বীয় মত বা স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করেন না। পরন্তু শত্রুতা ভঞ্জন করিয়া বিপক্ষদিগের মিত্ররূপে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। তিনি একজন যথার্থ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম। ব্রহ্মোপাসনা এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত-পালন-রূপ কর্ত্তব্য হইতে তিনি কখনই চ্যুত হন নাই। অবান্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া অনেকবার ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার মতান্তর হইয়াছে। কোনো কোনো ব্রাহ্ম সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি তাহাতে কিছুমাত্র ক্রোধ বা উত্তেজনার ভাব প্রকাশ না করিয়া

স্থিরভাবে স্বীয় মত রক্ষা করিয়াছেন। বরাহনগরের হিন্দুবিধবাশ্রম যখন লোকাভাবে উঠিয়া যায়, তখন ব্রহ্মর্ষি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে তাঁহার বরাহনগরের নিজ বসত-বাটী এবং কিছু অর্থসহ ঐ বিধবা-শ্রম অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহারাও বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তাঁহারা লিখিলেন যে, 'হিন্দু-বিধবাশ্রমের' পরিবর্ত্তে শুধু 'বিধবাশ্রম' এই নাম থাকিবে। "হিন্দু" নাম থাকিলে আমরা লইতে পারিব না। ব্রহ্মর্ষি তাহাতে সম্মত হইলেন না এবং ঐ কার্য্য গ্রহণ করিবার অন্য লোকও পাওয়া গেল না; সুতরাং ঐ আশ্রম উঠিয়া গেল। বরাহনগরের শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌-হলও তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় উহাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষির মত এই যে, সকল সমাজের লোকে-রাই সেখানে দেশহিতকর এবং স্ব স্ব ধর্ম্মানুরূপ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতাদি করিতে পারিবেন; কেবল কোনো ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা ধর্ম্মবিশেষকে কেহ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মগণ কেবল একেশ্বরবাদ ভিন্ন অন্য ধর্ম্মবাদের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ব্রহ্মর্ষি তাঁহার শেষ প্রতিষ্ঠান 'দেবালয়'ও সাধা-রণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু এবারও তাঁহারা ঐ পূর্ব্বোক্ত কারণেই 'দেবালয়' গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। দেবালয়ের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোনো কোনো ব্রাহ্ম ব্রহ্মর্ষি শশিপদর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই; ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ ও ঘনিষ্ঠতা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ আছে এবং তিনি তদনুরূপ স্থায়ী বন্দোবস্তও করিয়া রাখিয়াছেন।"

গোপালচন্দ্র দে দক্ষিণ-বরাহনগরের কালীনাথ দের পুত্র। কালীনাথ দে বরাহনগরে বাসকালে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। পরে মুঙ্গেরে রেলওয়ে আপীসে কার্য্য করিবার সময়েও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। প্রথম বয়সে গোপালচন্দ্রেরও ব্রাহ্মসমাজে রীতিমত যাতায়াত ছিল। একদিন প্রাতঃকালে গোপালচন্দ্র বিষণ্ণ ভাবে ব্রহ্মর্ষি শশিপদর নিকট আসিয়া অতি করুণস্বরে বলিল,—'আমি একটি গুরুতর জঘন্য কার্য্য করে ফেলেছি, যার জন্য আমি আর কাউকে মুখ দেখাতে পার্‌বো না, সুতরাং মনুষ্য-সমাজ হ'তে আমি একেবারেই বিদায় নেবো, তাই আপনাকে বল্‌তে এসেছি। আপনি আমার স্ত্রী-পুত্রের ভার নিন্‌। এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া সহানুভূতির সহিত সান্ত্বনাসূচক অনেক উপদেশ দিলেন এবং তাহাকে নিজের বাটীতেই রাখিলেন। গোপাল ব্রহ্মর্ষির বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং সদ্‌ভাবেও সে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষির নানা সৎকার্য্যে যোগদান এবং সাহায্য করিয়া ক্রমশঃ তাহার সর্ব্ববিষয়েরই উন্নতি হইয়াছিল। পরে সেই গোপালচন্দ্র দে গভর্ণমেণ্টের একসাইজ্‌ ডিপার্টমেণ্টে একটি ভালো চাকরী পাইয়াছিল।"

"আগরপাড়া-নিবাসী বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। এক সময়ে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেও বাহির হইতেন। অঘোর বাবু কলিকাতায় ব্রহ্মর্ষি শশিপদর বাড়ীতে একটি ঘরে বাস করিতেন। একবার মাঘোৎসবের সময় একদিন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে হঠাৎ উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন। পরলোকগত

ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বেদীতে উপবিষ্ট। মন্দিরে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। কেহই অঘোর বাবুকে নিরস্ত করিতে পারে না। অবশেষে কয়েকজন ব্রাহ্ম অতি কষ্টে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মন্দিরের পশ্চিম প্রাঙ্গনে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। পরে মন্দিরের কার্য্য যথারীতি চলিতে লাগিল। এই ঘটনার পর উক্ত অঘোর বাবু ব্রাহ্মসমাজের একজন ঘোর বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে-সেখানে ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষি তখন বরাহনগরে বাস করিতেন। অঘোর বাবুর ব্যবহার আলোচনা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় লোক-দিগকে লইয়া স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে এক মন্ত্রণা-সভা আহূত হয়। ব্রহ্মর্ষি শশিপদরও সেই সভায় উপস্থিত হইবার কথা। কিন্তু গাড়ির অসুবিধার জন্য বরাহনগর হইতে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উক্ত সভা ভঙ্গ হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি আসিয়া স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাসায়—বর্ত্তমান সাধনাশ্রমে দেখা করিলেন এবং সভায় কি স্থির হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, অঘোর বাবুকে সমাজ-পাড়ায় থাকিতে না দেওয়াই সকলের মত। ব্রাহ্মপাড়ায় বাস করিয়া তিনি এইরূপ ভাবে ব্রাহ্ম-সমাজের নিন্দা করিয়া বেড়াইবেন, সেটা ভালো নহে। লোকে সহজেই সব কথা সত্য বলিয়া মনে করিতে পারে; তাই সকলে উঁহাকে আপনার বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য আপনাকে বলিবার ভার আমার উপর দিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র ব্রহ্মর্ষি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'সে কি মশায়, উপদেশ দেবার সময় আপনারা বলে থাকেন,—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে জয় করবে; ভালবাসা দ্বারা শত্রুকে জয় করবে। কিন্তু কাজের বেলা এ কি হল?'

ব্রহ্মর্ষির এই কথা শুনিবামাত্র সরলহৃদয় গোস্বামী মহাশয় ভাবের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—'আপনি ঠিকই বলেছেন, অঘোর বাবুকে আমরা তাড়িয়ে দিতে পারিনে।' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি আনন্দমোহন বাবুর নিকট রওনা হইলেন। এখানে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, অঘোর বাবু যে সকল কথা বলিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহার কিছু কিছু ব্রহ্মর্ষির সম্বন্ধেও ছিল; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার মন অঘোর বাবুর প্রতি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। প্রার্থনার সাহায্যে ব্রহ্মর্ষি অঘোর বাবু ও তাঁহার পরিবারের প্রতি আরো অধিক সদ্ভাব ও ভালবাসা দিতে লাগিলেন। তখন দিনের মধ্যে অনেক সময় তিনি অঘোর বাবুদের সঙ্গে থাকিতেন এবং আলাপাদি করিতেন। ব্রহ্মর্ষি বুঝিয়াছিলেন যে, অঘোর বাবুর মাথা খারাপ হইয়াছে। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাই সফলও হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অঘোর বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তাহা এই ঘটনার অনেক পরে।"

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বৈদ্যনাথ নামক জনৈক দেশীয় কায়স্থ-সন্তান ব্রহ্মর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—'মশায়, আপনার উদারতা এবং বিপন্নের প্রতি সহানুভূতির কথা শুনে আমি আপনার নিকটে এসেছি, আমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু তাতে আমার বিশ্বাস নেই; সুতরাং আমি সে ধর্ম্মে অবিশ্বাসী এবং সে-ধর্ম্মের ভিতর শান্তি না পেয়ে বড়ই যাতনা ভোগ করচি; ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব জানবার জন্য অনেক সন্দেহ নিয়ে আমি পাদরী সাহেবদিগের শরণাপন্ন হয়েছিলুম, কিন্তু তাঁদের কেহই আমার সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারেন নি। মহাত্মা যীশুর ঈশ্বরত্ব কেহই প্রমাণ করে দিতে পারলেন না। আমার স্ত্রী ও আমি যে পাদরী সাহেবের অধীনে চাকরি করতুম, ধর্ম্মদ্রোহী বলে

তিনি আমাদের দু'জনকেই তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরাশ্রয়; আপনি যদি আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে আমরা বাঁচতে পারি।' ব্রহ্মর্ষি শশিপদ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন,—'আপনার কি খৃষ্টধর্ম্মে সত্যিই বিশ্বাস নেই? প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়? ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁর অস্তিত্বে আস্থা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সুতরাং ভগবানের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বিশ্বাসের বল ও মাধুর্য্য হৃদয়কে দুর্জ্জয় বলশালী এবং মধুময় করে তুলবে। নতুবা আমরা যদি তাঁকে প্রমাণের অধীন করে ফেলি, তা হলে তো তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্র মানবের হাতের পুতুল হয়ে পড়বেন,—তাঁর ঈশ্বরত্ব চলে যাবে। আপনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ বক্তা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আপনার সন্দেহের কথা বলুন; তিনি আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করে দেবেন এবং আপনার এই দুরবস্থারও একটা উপায় করে দেবেন'।"

বৈদ্যনাথ ব্রহ্মর্ষির আদেশানুরূপ কার্য্য করিল। কিন্তু তাহাতে তাহার কোনো উপকার হইল না। সুতরাং সে উহার ১০।১৫ দিন পরে আবার ব্রহ্মর্ষির নিকট আসিয়া কাতর ভাবে বলিতে লাগিল,—'দেখুন, আমার প্রাণের ভিতর একটা দাগ বসে গেছে, আমি কিছুতেই তা মুছে ফেলতে পারচি নে। আমি নিরন্তর যে মর্ম্মভেদী যাতনার আগুনে দগ্ধ হচ্চি, তাতে আমি আর বেশীদিন বাঁচবো বলে মনে হয় না। আমি অন্য এক জায়গায় দুটি চাকরির জোগাড় করেছিলুম, কিন্তু ঐ পাদরী সাহেব সেখানে চিঠি লিখে আমায় চাকরি দিতে নিষেধ করেছেন। আমি এখন একেবারেই নিরাশ্রয়।'

করুণহৃদয় ব্রহ্মর্ষি আর বেশী কথা শুনিতে পারিলেন না। তাঁহার

কোমল প্রাণ ঐ ব্যক্তির দুঃখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উহার কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন এবং প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন,—'আপনি মিশনারীদের আশ্রয়ে থাকতেন, সেখানে এখন আপনার দাঁড়াবার স্থান নেই; অন্য কোথাও থাকবারও তেমন সুবিধে দেখ্‌চি নে; বিশেষতঃ এখন আপনার আয়ও কিছু নেই, অতএব আপনি আমার বাড়ীতে এসে থাকুন। নিজের বাড়ী মনে করেই এখানে থাক্‌বেন। কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ কর্‌বেন না'।"

বৈদ্যনাথ যেন অকূল পাথারে কূল পাইল। আনন্দাতিশয্যে তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। সে নীরবে ব্রহ্মর্ষির পদধূলি লইয়া গেল এবং সেই সেপ্টেম্বর মাসের ২২শে তারিখে সস্ত্রীক ব্রহ্মর্ষির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মর্ষি উহাদের বাসের জন্য নিজ বাটীর মধ্যে পৃথক্ ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং উহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উহার 'অতীত দুঃখের স্মৃতি' অপনোদনের জন্য বিবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া অজ্ঞাতসারে বৈদ্যনাথের অন্তরের ভিতর এমন ধর্ম্মভাব ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলেন যে, সে যেন নবজীবন লাভ করিল—এমন কি সে যে পূর্ব্বোক্ত সেই ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল। সাধনার কি অসীম বল! প্রেমের কি অদ্ভুত শক্তি!

উপরোক্ত ঘটনার বহুপূর্ব্বে রজনীকান্ত ঘোষ নামক এক পূর্ব্ববঙ্গীয় যুবক ব্রহ্মর্ষির নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়। সেই যুবকটিকেও তিনি নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ক্রমশই ব্রহ্মর্ষির সৎকার্য্যাবলীর সংস্পর্শে আকৃষ্ট হইতে থাকে। সহানুভূতিপূর্ণ উৎসাহ এবং অনুশীলনের সুযোগ পাইয়া,

বাংলা ভাষার উপর তাহার বেশ দখল জন্মিয়াছিল। কালে সে বরাহ-নগরের অনেক গণ্যমান্য লোকের সহিত পরিচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একদিন সে হাইকোর্টের translater বাবু বিহারীলাল বসু নামক জনৈক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় ঢুকিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সাময়িক দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া তথা হইতে একটি ঘড়ি চুরি করে। উহা জানিতে পারিয়া সেই গৃহস্বামী পুলিশে খবর দেন, পরে ঐ ব্যক্তি ধৃত হইয়া জেলে যায়। এই দুর্ঘটনায় ব্রহ্মর্ষি শশিপদ অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিন্তু যুবকটিকে সৎপথে আনিবার জন্য তিনি উহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া উহাকে 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়া এক সহানুভূতিপূর্ণ বিস্তৃত চিঠি লিখিয়া জেলখানায় পাঠান।

কারামুক্ত হইয়া সেই যুবক প্রথমেই ব্রহ্মর্ষির নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ, সে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ দুইখানি পত্র পাইয়া যুগপৎ অত্যন্ত অনুতপ্ত ও আশ্বস্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি তাহার দোষের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া পূর্ব্বের মত সাদরে তাহাকে বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। যুবকটি ব্রহ্মর্ষির এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যবহারে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তদবধি তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পরে সেই যুবক 'শ্রীধর ঘোষ' নামে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহকারী পরিচালক হইয়া উঠিল। তাহার জীবন ধন্য হইল। যথার্থ ব্রাহ্মের সংস্পর্শে আসিয়া আত্মার অধোগতি ঘুরিয়া ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হইল। অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

আপাত-দৃষ্টিতে ব্রহ্মর্ষির ঐ যুবকটিকে দ্বিতীয় বার গৃহে স্থান দেওয়া সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত বলিয়াই মনে হয়। সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে অপরাধী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া বা তাহাকে সাহায্য করা অন্যায়ের প্রশ্রয়দান বলিয়াই মনে হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ দৃষ্টির উপরে ব্রহ্মর্ষি

যে তীক্ষ্ণ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তিনি ঐ যুবকের ভবিষ্যৎ দর্শন করিলেন এবং অসাধারণ ভাবে পরিচালন করিয়া উঁহাকে নূতন জীবন দান করিলেন। যাঁহারা নিরাকার পরব্রহ্মের সত্য-উপাসক, তাঁহারা এইরূপ অসম্ভবের ভিতর দিয়াই মহৎকার্য্য সকল সুসম্পন্ন করেন এবং ভাবী বংশধরগণের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

"বরাহনগর-নিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন এবং মাঝে মাঝে ব্রহ্মর্ষি শশিপদর সহিত আলাপ করিতেন। ব্রহ্মর্ষির অমায়িক ব্যবহারে এবং চরিত্রের মহত্ত্বে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন এবং উঁহার জনহিতকর কার্য্যাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে নানারূপ অশান্তির কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার গৃহ বিবিধ অত্যাচার দুর্নীতি এবং চরিত্রহীনতার আবাস হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল কারণে তাঁহার প্রাণে যে কি একটা ভীষণ মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক নূতন উন্নতির উচ্চতম সোপানে অধিরোহণের জন্য পূর্ণোদ্যমে সচেষ্ট, আর তাহার বাটীতে এই জঘন্য লীলা। পরিশেষে তিনি যখন নিজ সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন, বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলের প্রতি তখন তাঁহার বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, কোথায় গিয়া আশ্রয় লইবেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। এই বিপদের সময় তিনি ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ব্যতীত আর কাহাকেও সাহায্যকারী দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া তিনি হৃদয়ের যে সকল উচ্চভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই বলে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। স্ত্রী, শিশু-কন্যা, তরুণ-বয়স্কা বিধবা পিতৃব্য-পত্নীসহ ব্রহ্মর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন

তিনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মর্ষি তাঁহার হৃদয়ভেদী দুঃখবিবরণ শুনিয়া সমবেদনায় অভিভূত হইলেন এবং উঁহাদের সকলকেই স্বীয় আলয়ে আশ্রয় দান করিলেন। তদবধি তিনি উঁহাদের মানসিক অশান্তি অপনোদনের জন্য ধর্ম্মালোচনা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি নানারূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্তপ্তচিত্তে শান্তি-সমীরণ কুসুম-সুবাস ছড়াইতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে একটি চাকরি (Sub Inspector of Schools) করিয়া দিলেন। তখন অতীতের স্মৃতি তাঁহার নিকট মরীচিকা বোধ হইতে লাগিল। সেই হইতে জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহারা শান্তিতে যাপন করিতে লাগিলেন।"

"একবার যখন ভীষণ ওলাউঠা রোগে বরাহনগরের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, মানব যখন মানবের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়া যাইতেছিল, আত্মীয়-স্বজন যখন রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে ভীত হইত, সেই সময়ে সেবাব্রত শশিপদ পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের বিশ্বজনীন প্রীতির ভাব হৃদয়ে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের ঔষধ পথ্য সেবা পরিচর্য্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।"

"দুর্ভিক্ষের দারুণ প্রকোপে একবার বহুলোক অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইতেছিল, কত ক্ষুধাতুর নরনারী একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছিল। সেই সময়ে পরদুঃখকাতর সেবাব্রত শশিপদ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কত লোকের মুখে নিজের আহার দান করিয়াছেন। অনাহারে মৃতপ্রায় কত নরনারী ব্রহ্মর্ষির সাহায্যে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। একমুষ্টি অন্নের জন্য যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, তাহাকে ভোজন করাইয়া ব্রহ্মর্ষির প্রাণে কি অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও ভক্তিভাবের উদয় হয়, ভুক্তভোগীমাত্রেই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারে। সেই সময়ে ব্রহ্মর্ষি নিজের

অভাব ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা একেবারে ভুলিয়া গিয়া অকাতরে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিয়াছেন।”

“ব্রহ্মর্ষি শশিপদর আর একটি অত্যাশ্চর্য্য গুণ এই যে, তিনি মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া রোগীর সেবা করিতে পারেন। উৎকট যন্ত্রণায় কাতর কোনো রোগীর আপাদমস্তকে হাত বুলাইয়া তিনি এরূপ শান্তি দিতে পারেন যে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধেও তত শীঘ্র সেরূপ কাজ করিতে পারে না। তাঁহার হস্ততল এমন কোমল উপাদানে গঠিত যে, যিনি তাঁহার করস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তিনিই উহা উপলব্ধি করিয়াছেন। যে সকল রোগীর মস্তক ও কপালে তিনি হস্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকে ‘আঃ! কি কোমল হস্ত!’ বলিয়া প্রাণে সান্ত্বনা পাইয়াছে। সম্প্রতি একদিন রাত্রিকালে তিনি তাঁহার পীড়িতা জ্যেষ্ঠা কন্যার অজ্ঞাতসারে তাঁহার রোগশয্যায় গিয়া বসিয়া তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। তাহাতে আরাম পাইয়া রোগী নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন,—‘আঃ!’ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে গা?’ পরে যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতৃদেবই তাঁহার শয্যায় বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন; তখন বলিলেন,—‘বাবার হাত না হ’লে এমন নরম হাত আর কার হবে?’ ব্রহ্মর্ষির আর একটি লক্ষণ এই দেখা গিয়াছে যে, কাহারো সেবা করিতে করিতে তাঁহার চোখ বুজিয়া আসে। তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহার নিজের স্পন্দন কমিয়া আসিতেছে। এমন তন্ময়তা এবং আত্মনিয়োগ যেখানে, সেখানে সুফল না হইয়া যায় না—রোগীর প্রাণে শান্তি বা আরাম না আসিয়া থাকিতে পারে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সময় কাটানোর মত কাজ এবং প্রাণের টানে হৃদয়ের প্রেরণায় কাজ এই দু’য়ের পার্থক্য এইখানেই অনুভূত হয়।

ব্রহ্মর্ষির শশিপদর আর একটি প্রধান কাজ দরিদ্র মৃত ব্যক্তির সৎকার

করা। অনেক নিঃসম্বল ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তিনি অর্থব্যয় করিয়া তাহাদের সংকার করিয়া দিয়াছেন। একদা তাঁহার পল্লীতে জনৈক বৈষ্ণব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার আর কেহই ছিল না। তাহার শবদেহ গৃহমধ্যে পতিত রহিয়াছে জানিয়া ব্রহ্মর্ষি স্থানীয় বৈষ্ণবদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া শবদাহ করিতে অস্বীকার করিলে তিনি অর্থদ্বারা তাহাদিগকে স্বীকৃত করাইলেন। বরাহনগরের গরীব লোকেরা বলিত,—“শশিপদ বাবু বেঁচে থাকতে থাকতে আমরা যদি মরে যাই, তবে আর ডোমের হাতে যেতে হয় না।” ব্রহ্মর্ষি শশিপদ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই বিবিধ উপকার করিয়া আসিতেছেন। মুসলমানদের দেহ সমাহিত করিতে ব্রহ্মর্ষির নিকট অর্থ চাহিয়া কেহ বিফলমনোরথ হয় নাই। তাঁহার অমানুষিক সেবার কার্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া ভট্টপল্লী-নিবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘সেবাব্রত’ উপাধিতে বিভূষিত করেন।”

“একদা এক অসচ্চরিত্র যুবা পিতামাতার নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। গঞ্জিকাসেবন, মদ্যপান, ব্যভিচার, পরধনহরণ প্রভৃতি কোনো প্রকার পাপকার্য্য করিতে সে দ্বিধাবোধ করিত না। প্রতিবেশিগণ তাহার চেহারা দেখিলেই ভয় পাইত। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ সেই যুবাকেই স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যে কতবার পলায়ন করিয়াছে এবং কতবার তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।”

ব্রহ্মর্ষি আজীবন নীরব সাধনার বলে প্রাণকে এমন কমনীয় ও কোমল করিয়া তুলিয়াছেন যে, যখনই তিনি কোনো গরীবের দুরবস্থার কথা অথবা তাহাদের কোনোরূপ বিপদের কথা জানিতে পারেন, তখনই তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয় সেই দিকে ধাবিত হয়। সরসীর স্বচ্ছবারি যখন যে দিকে

একটু নীচু রাস্তা পায় সেই দিকেই আপনার কোমল দেহ ঢালিয়া দিয়া শস্যরাজি সজীব করে, শশিপদ বাবুর প্রাণও যখনই কোনো বিপন্নের বিপদ্‌বার্ত্তা শুনিয়াছে, তখনই নিজেকে ঢালিয়া দিয়া সেই বিদ্‌পজাল ভাসাইয়া দিয়াছে।”

ব্রহ্মর্ষি আজীবন গরীবের উপকার করিয়া আসিতেছেন, পাপী তাপীকে সান্ত্বনা দান করিয়া আসিতেছেন। সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার নিকট সমান প্রিয়। তাঁহার নিজের সত্ত্বা সকলের অভ্যন্তরে ডুবাইয়া দিয়া নিজেকে অনন্তের অমৃতত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার জীবনে আমরা প্রেমের এই অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাই। তিনি নিজেও স্বকীয় সত্ত্বা যেরূপ ভাবে বিরাট পুরুষের অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ দত্তের প্রতি উপদেশে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ দত্ত ব্রহ্মর্ষির জনৈক প্রিয় যুবকবন্ধু। তিনি বরাহনগরে থাকিতেন এবং কলিকাতার কুক্ কোম্পানীর আপীসে চাকরী করিতেন। সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত তাঁহার আপীসের কাজ। বাড়ী হইতে আপীসে যাতায়াতেও ৩ ঘণ্টা সময় লাগিত। এত সময় ব্যয় করিয়াও তিনি সাহিত্য সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত “চারুনীতিপাঠ” প্রভৃতি গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায়। ব্রহ্মর্ষির সহবাসে কাটাইবার জন্য তিনি উহার মধ্যেই সময় করিয়া লইতেন। কার্য্যজীবন তাঁহার সুখময় ছিল, কিন্তু পারিবারিক জীবনের অশান্তি কোলাহলে তাহাকে নিয়তই বিব্রত হইতে হইত।

একদিন উক্ত কালীকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্মর্ষির নিকট বলেন, “মশায়, আমার সংসার-জীবন ভালো লাগে না, বিজন কাননের বিহঙ্গকুলের স্বরলহরী আমার প্রাণকে আকুল করচে।” ব্রহ্মর্ষি ঐ কথার

কি সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পড়লে প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্বেশ্বরের বিশালত্বে ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। বিশ্বাসের স্রোতোধারা প্রবল বেগ ধারণ করে। ব্রহ্মর্ষি বলিয়াছিলেন,—"কালীকৃষ্ণ, সাহসী সৈন্য কামানের শব্দ শুনেই স্বস্থান হ'তে পালিয়ে যান না, সেনাপতির আদেশ পালনেই তাঁর গৌরব। তাতে যদি মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়, তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। এই সংসার-সমরে পরমেশ্বর পরিচালক, আমরা তাঁর সামান্য সৈন্যমাত্র, বিপদ্রূপ যত কামান গর্জ্জনই হোক না কেন তিনি আমাদের যেখানে যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই স্থানে সেই অবস্থায় থেকে নির্ভীক চিত্তে তাঁর আদেশ প্রতিপালনেই আমাদের গৌরব। তাঁর কার্য্য সম্পাদন করলেই জীবন ধন্য হয়, আমাদের নিজস্ব কিছুই নেই ; অতএব আমাদের সংসারে অকারণ উদ্বেগকে ডেকে এনে অশান্তি বাড়াবার প্রয়োজন কি ?" কি জ্বলন্ত বিশ্বাস! ব্রহ্মর্ষির এই উপদেশ শুনিয়া কালীকৃষ্ণ বাবুর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজে নিয়মমত যোগদান করিতেন। ব্রহ্মর্ষির অমৃতোপম উপদেশে তিনি সংসার অরণ্যে শান্তিতরুর অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়া তাহার শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের উপদেশ বাণী প্রাণের ভিতর যখন কার্য্য করে, দুঃখস্রোত তখন শান্তি-সমুদ্রের দিকে প্রবল বেগে ছুটিয়া যায়। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ একজন যথার্থ ব্রাহ্ম, কেন না, তিনি শান্তিসংস্থাপক এবং গরীবের বন্ধু।

নব্যভারত-সম্পাদক পরলোকগত শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় যে দিন সস্ত্রীক প্রথম কলিকাতায় আসেন, সে দিন গাড়ীভাড়া দিবার পয়সা তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি সস্ত্রীক গাড়ী হইতে নামিয়া ভাড়া দিবার জন্য বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ঐ কথা শুনিবামাত্র তখন উহার গাড়ীভাড়ার টাকা

দিয়া দেন। গত ৩রা নভেম্বর (১৯২০) উক্ত দেবীপ্রসন্ন বাবুর শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার সুযোগ্যা পুত্রবধূ শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী তাঁহার শ্বশুরের যে জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন, গত ১লা অগ্রহায়ণের (১৩২৭ সাল) তত্ত্ব-কৌমুদীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে? উহার একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"একদিন যাহার সহিত পরিচিত বা যাহার কাছে উপকৃত হইয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতেন না। আলাপ হইলেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেন। যে দিন প্রথম তিনি (শ্বশুর মহাশয়) শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীকে নিয়া কলিকাতায় আসেন সে দিন গাড়ীভাড়া দিবার পয়সা তাঁহার হাতে ছিল না। শ্রদ্ধেয় শশিপদ বাবু সেই ভাড়া দিয়াছিলেন। এই উপকারটি তিনি চিরজীবন মনে করিয়া রাখিয়া-ছিলেন ও কতবার আমাদের নিকট এ কথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।"

কে কাহার উপর বা কাহারা কাহাদের উপর শক্তি সঞ্চার করে। এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলিবেন, মহৎ ক্ষুদ্রের উপরেই নিজ শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা স্থূলদর্শীর স্থূল কথা। সূক্ষ্মদর্শী বলেন,—"মহৎ যেমন ক্ষুদ্রের উপর শক্তি সঞ্চার করেন, তেমনি ক্ষুদ্রও মহতের উপর শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে।" একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুও বিশালকায় পর্ব্বতশ্রেণীর উপরেও শক্তি সঞ্চার করে। সূর্য্য যেমন সৌরজগতে সকলের উপর নিজ মহতী শক্তি বিকীরণ করিয়া থাকে, একটি ক্ষুদ্র তারাও সেইরূপ সমস্ত জড়জগতে ও প্রাণিজগতে এক অদৃশ্য শক্তি সঞ্চার করিয়া স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করিতেছে। চন্দ্র কত দূরে থাকিয়া ভূতলস্থ সমুদ্রের উপরে স্বীয় স্নিগ্ধ কৌমুদীর শক্তি সঞ্চার করিয়া সেই স্থির মহাসমুদ্রের বারিরাশি উচ্ছ্বসিত করিয়া

থাকে। বড়র উপর ছোটর শক্তিসঞ্চার যেমন জড়জগতে দেখা যায়, সেইরূপ প্রাণী জগতেও উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। মহাত্মাদিগের জীবনের শক্তি ক্ষুদ্র মানবের জীবনে সঞ্চারিত হইয়া নিয়তই কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রহ্মর্ষি বলেন, "আমি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নই, ভারতীয় ঋষিদিগের বাক্য যাহা কিছু শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, তাহাতেই সেই সামান্য শক্তির সঞ্চারেই আমার প্রাণে যে অসামান্য কার্য্য করিয়াছে তাহাতে আমি জানিয়াছি এবং আমার কার্য্যপরিদর্শকেরাও জানিবেন যে, সেই ঋষিদিগের শক্তিই আমাকে চিরদিন জাতীয় ভাব রক্ষায় জাগরিত রাখিয়াছে। এইরূপ বিদেশীয় মহাত্মাদিগের (মহম্মদ, যীশু প্রভৃতির) শক্তিও আমার জীবনে প্রভূত শক্তিসঞ্চার করিয়াছে। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের শক্তি যেমন আমার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আমার সমসাময়িক মনস্বিগণও তাঁহাদের শক্তি আমাতে সঞ্চারিত করিয়াছেন। যাঁহাদের নিকট হইতে আমি উপদেশ পাইয়াছি, তাঁহাদের শক্তিত কার্য্য করিবেই, যাঁহাদের নিকট হইতে কোনো উপদেশ পাই নাই, তাঁহাদের শক্তিও আমার জীবনে কার্য্য করিয়াছে। আমি তাঁহাদের সকলকেই গুরু জানিয়া ভক্তির সহিত তাঁহাদের চরণে প্রণাম করি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গভীর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, কেশবচন্দ্রের জ্বলন্ত বাক্য, প্রতাপচন্দ্রের যুক্তি ও কবিত্বপূর্ণ বাক্যবিন্যাস যেমন আমার প্রাণকে মাতাইয়াছিল, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের ছোট ছোট সরল কথাগুলি শুনিয়া আমি তেমনি মুগ্ধ হইতাম। দক্ষিণেশ্বর শম্ভু মল্লিকের বাগানে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত আমার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি সাধারণের নিকটে পরিচিত হন নাই। সেই সময়ে আমি তাঁহার মুখের সরল সাধারণ অথচ মহাভাবপূর্ণ কথা শুনিয়া প্রাণের মধ্যে যে শক্তি-সঞ্চিত করিয়া আসিতাম, তাহার স্ফুরণেই

আমার জীবন বহু কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। এইরূপ আমার সমসাময়িক হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মহোদয়গণের শক্তিও আমার জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে।" এইরূপে মহতের শক্তি যেমন ব্রহ্মর্ষিতে সঞ্চারিত হইয়াছে সেইরূপ ব্রহ্মর্ষির ক্ষুদ্রশক্তিও মহতে সঞ্চারিত হইয়াছে একথাও বলা যাইতে পারে।

শক্তির বিনিময় জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। একটি অতি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অতিবড় বনস্পতিতেও শক্তি প্রকাশ করে। বিন্দুপরিমাণ হোমিওপ্যাথী ঔষধ মানবদেহে সঞ্চারিত হইয়া অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে।

বরাহনগরে যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে ঐ সমাজের উপাসনা প্রণালী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন উপাসনাপ্রণালীর সহিত সর্ব্বাংশে একরূপ ছিল না। লোকমুখে সেই সমস্ত কথা শুনিয়া তখন কেশবচন্দ্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। ব্রহ্মর্ষি শশিপদপ্রতিষ্ঠিত বরাহনগরের সাধারণ ধর্ম্মসভায় উদার ভাব সকল—সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা স্ব স্ব ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে ও উপদেশ দিতে সেখানে আহূত হইতেন এবং স্বাধীন ভাবে তাঁহারা স্বীয় মত প্রচার করিতেন, ইত্যাদি নূতন পদ্ধতি যাহা তখন ভারতে প্রচারিত হয় নাই, সেই সকল উদার ভাব প্রচারিত হওয়াতে অনেকে ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এমন কি, যে কেশব বাবু পরে নববিধানে উক্ত উদার ভাব প্রচার করিয়াছিলেন, তিনিও তখন বরাহনগরের ঐ সকল উদার ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই; বরং তিনি উহার প্রতিবাদ করিতেন।' ইণ্ডিয়ান্ মিরার নামক দৈনিক

ইংরাজী সংবাদপত্রে সেই সকল প্রতিবাদ প্রকাশিত হইত। ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে স্বয়ং কেশব বাবু যখন নববিধানে ঐ উদার ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন এ কথা বলা যায় যে, বরাহনগরের ঐ ক্ষুদ্র কার্য্যের ক্ষুদ্র শক্তি মহান্ কেশবচন্দ্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল। অবশ্য শক্তিশালী ব্যক্তি ক্ষুদ্রের নিকট তাহার ক্ষুদ্র শক্তি ভিক্ষা করেন না; তথাপি সেই ক্ষুদ্র শক্তি অযাচিত ভাবে অলক্ষ্যে মহতের নিকট উপস্থিত হয়, আশ্রয় গ্রহণ করে। মহৎ আশ্রয় পাইয়া সেই ক্ষুদ্রশক্তি তখন মহাপ্রভাবের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তখন সকলে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হয়। কেহই কোনো দিন ভাবে না যে, এ শক্তি কোথা হইতে আসিল। ভগবানের রাজ্যে ইহাই নিয়ম। একটি অনু পরিমাণ ক্ষুদ্র বীজ কোথা হইতে আসিয়া উর্ব্বরা ভূমিতে পতিত হইল, বীজ যখন পড়িল তখন কেহই তাহা জানে না। পরে যখন সেই বীজ হইতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, তখন সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হয়। কিন্তু কেহই ইহা অনুসন্ধান করে না যে, কোন্ বনের কোন্ গাছের কোন্ ফল হইতে এই বীজ আমাদের নগরে আসিয়াছে।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদর অন্তঃকরণ যে অত্যন্ত কোমল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হয়। অন্যের মনে ব্যথা লাগিলে তাঁহার অন্তরে আঘাত লাগে। এই সহৃদয়তা এবং কোমলহৃদয়তাই তাঁহাকে বিধবাবিবাহে উদ্যোগী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে তিনি বিধবাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বয়স যখন আট নয় বৎসরমাত্র সেই সময়ে তাঁহাদের বাটীতেই এক লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মর্ষিদের বাড়ী বহুপরিবারে পূর্ণ ছিল। তাঁহাদের বাড়ীর মত একান্নবর্ত্তী ও বহুজনসমাকুল বাটী সে সময়ে বরাহনগরে আর কাহারো ছিল না। সেই বাটীর

একটি বিধবা কুপথে গমন করে। একদিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বাড়ীর সকলে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা জাতি ও সম্মান রক্ষার জন্য সেই রাত্রিতেই তাহাকে কোথা হইতে ধরিয়া আনিলেন। বিধবা গৃহমধ্যে আনীত হইলে তাহাকে প্রহার আরম্ভ হইল। ব্রহ্মর্ষি বলেন, 'সে নিষ্ঠুর প্রহার ও সেই বিধবার কাতরধ্বনি মনে হইলে এখনো হৃৎকম্প হয়।' ব্রহ্মর্ষি তখন আট নয় বছরের বালক, তখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে। তিনি দেখিতেন, সেই বিধবাকে একটি ক্ষুদ্রগৃহে দিনরাত তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং গভীর রাত্রিতে যখন বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত হইত, সেই সময়ে বাড়ীর কয়েক জন নিষ্ঠুর পুরুষ সেই ঘরে গিয়ে তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিত। সেই শব্দে বাটীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইত এবং সকলে বাহিরে আসিয়া নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতেন। সেই ভীষণ প্রহারে এবং তাহার কাতর ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া সেই বয়সেই ব্রহ্মর্ষি অস্থির হইতেন। এইরূপ ভাবে প্রহারের তিন দিনের দিন রাত্রিতে হতভাগিনী সেই ভীষণ প্রহার আর সহ্য করিতে পারিল না। সেই নিদারুণ প্রহারের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় সে প্রাণত্যাগ করিল এবং সেই রাত্রেতেই তাহার দাহাদি কার্য্য শেষ হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রচার করা হইল যে, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বাল্যকালে এই যে ব্রহ্মর্ষির কোমল হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, প্রাপ্তবয়সে উহাই তাঁহাকে বিধবার দুঃখবিমোচনে দৃঢ়সঙ্কল্প করে। তিনি ভাবিতেন এইরূপ মর্ম্মন্তুদ ঘটনা যে কেবল আমাদের বাড়ীতেই হইল তাহা নহে, অনেকের বাড়ীতেই এই প্রকার নির্দ্দয় ভাবে বিধবাবধরূপ অমানুষিক পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মর্ষির বয়স যখন ১৫ বৎসর সেই সময়ে (১৮৫৬ খৃঃ)

বিধবাবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হয়। সেই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মর্ষি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। যে রাত্রিতে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিধবার সহিত বিবাহ হয়—(সেইটি এদেশে প্রথম বিধবাবিবাহ, ঐ বিবাহকার্য্য মহা আড়ম্বরের সহিত কলিকাতাতেই সম্পন্ন হয়) ব্রহ্মর্ষি ঐ বিবাহ দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু একজন সঙ্গী না পাইলেও যাইতে পারেন না। তাঁহাদের বাড়ীর নিকটে একঘর ময়রা ছিল, তাহাদের অঘোর নামক একটি বালক ব্রহ্মর্ষির সঙ্গী হইল। তখন তিনি তাঁহার সহপাঠী গোবিন্দ পালকে লইয়া অঘোরের সঙ্গে একত্র যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এত কষ্ট করিয়া যাওয়া বৃথা হইল। সে স্থানে এত জনতা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বিবাহ-বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই পারিলেন না। ঐ বিবাহ কলিকাতার একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেই রাত্রিতে সমস্ত কলিকাতাটা যেন টলটলায়মান হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি যদিও ঐ বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু সেই বিবাহের উৎসব তিনি অন্তরে উপভোগ করিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার হৃদয় প্রবল ভাবে আন্দোলিত করিয়া দিয়াছিল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিংশতি বর্ষ বয়সে ব্রহ্মর্ষির বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পরেই তিনি স্বীয় অল্পবয়স্কা স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। সকল বাধা বিঘ্ন নিন্দা গঞ্জনা অতিক্রম করিয়া তিনি যখন নিজ স্ত্রীর পড়াশুনা অক্ষুণ্ণভাবে চালাইতে লাগিলেন, তখন বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরাও ক্রমশ বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মর্ষি শশিপদর জ্যেঠতুত ভগিনীর একটি অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা ছিলেন। সেই মেয়েটির জননী কুলীন পত্নী, তিনি সধবা। তাঁহারা মায়ে ঝীয়ে বাটীর অন্যান্য বয়স্থা মেয়েদের সঙ্গে

ব্রহ্মর্ষির নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে ঐ বিধবার মাতুল ব্রহ্মর্ষির জ্যেঠ্‌তুত্‌ ভাই সারদা বাবু যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার। কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে নড়াইল লইয়া যান। কুচবিহার রাজ্যের চিফ্‌ জষ্টিস্‌ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই সময়ে নড়াইল স্মল্‌স্কজ্‌ কোর্টের হেডক্লার্ক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে সারদা বাবুরও মত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সারদা বাবুও ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত সৎকার্য্যাবলীর উৎসাহদাতা হইলেন। সুতরাং তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া তাঁহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর পড়াশুনা বন্ধ হইল না। পরন্তু বিধবা ভাগিনেয়ী একাদশীর দিন উপবাসের কষ্ট হইতে রক্ষা পাইলেন। এ দিকে বরাহনগরে ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ব্রাহ্ম সমাজ লইয়া তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছেন। সে সকল আন্দোলন ও নির্য্যাতনের বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সেই সময়ে সারদা বাবু ব্রহ্মর্ষিকে সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিতেন। পরে পূজার বন্ধে সারদা বাবু যখন বাড়ী আসেন, সেই সময়ে নানা কারণে তিনি নিজ মত পরিবর্ত্তন করেন। সেই উদার সংস্কারমূলক মত আর তাঁহার রহিল না। নড়াইল হইতে বাড়ী আসিবার পথে নৌকায় উঠিয়াই তিনি তাঁহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে উপদেশ দিলেন যে, "তোমরা এখান হ'তে একটু সাবধানে চল্‌বে, বাড়ীতে গিয়ে শশীর সঙ্গে তোমরা আর সেরূপ মেশামিশী কোরো না।" ভাগিনেয়ীকে পুনর্ব্বার একাদশীর উপবাস করিতে বলিলেন। সুতরাং বাটী আসিয়া তাঁহারা ব্রহ্মর্ষির সহিত প্রকাশ্যে আর তেমন মিশিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সেই বৎসর মাঘ মাসে ব্রহ্মোৎসবের সময়ে ব্রহ্মর্ষি সস্ত্রীক আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন। সেইবারেই ব্রহ্মর্ষির জাতি একবারে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

উপবীতাদি পরিত্যাগ করিয়াও তিনি বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যাওয়ায় বাটীর স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাঁহাদিগকে চাপিয়া ধরিলেন। তখন ব্রহ্মনিষ্ঠ শশিপদ ভাবিলেন যে, এ বাড়ীতে থাকিয়া আমি স্বাধীন ভাবে আমার কাজ করিতে পারিব না এবং আমার স্ত্রী পরিবারেরও উন্নতি হইবে না; সুতরাং আমার দূরে যাওয়াই ভালো। এই স্থির করিয়া তিনি বাটীর নিজাংশ তুল্য জমি ও এমারতের কিঞ্চিৎ মূল্য লইয়া ১৮৬৬ সালের জুন মাসে (২৭শে জ্যৈষ্ঠ) বাড়ীর নিকটস্থ একটি ভাড়াটে বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। তাঁহারা যখন নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত জ্যেঠ্‌তুত ভগিনী বিধবা কন্যাসহ তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে উৎসুক হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য ব্রহ্মর্ষিকে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, আমার বাড়ী নাই এবং কোথায় থাকি কোথায় যাই তার ঠিক্ নেই। তোমরা আমার সঙ্গে কোথায় যাবে? তবে যখন আমার নিজের বাড়ী প্রস্তুত হবে, তখন তোমাদিগকে সেই বাড়ীতে আন্‌বো।" পরে ব্রহ্মর্ষির নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইলে তিনি সস্ত্রীক নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন (১৮৬৮ খৃঃ ৮ই মার্চ্চ) তখন তাঁহার ঐ ভগিনী তাঁহার আশ্রয়ে আসিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, পত্রদ্বারা ব্রহ্মর্ষিকে তাহা জানাইলেন, ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদিগকে আসিতে অনুমতি দিলেন। ১৮৬৮ সালের ২৬শে জুন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উক্ত ভগিনী ও ভাগিনেয়ী ব্রহ্মর্ষির বাটীতে আসেন।

এই ঘটনায় আবার গ্রামের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সারদা বাবু তখন জনাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার। ব্রহ্মর্ষি সারদা বাবুকে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিলেন,—"হয় তুমি এখানে আসিয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে এই গোলযোগে যোগ দাও, না হয় ধীরভাবে ওখানে

থাক। এই দুয়ের মধ্যে যেটি তোমার মনোমত হয় তুমি তাহাই করিতে পার।” বাটী হইতেও সারদাবাবুর নিকট এই সংবাদ গেল। সুতরাং ব্রহ্মর্ষির পরামর্শানুসারে তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। শনিবারে বাটী আসিলেন। এ দিকে ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর আগমনে ব্রহ্মর্ষির গৃহে বিশেষ ভাবে উপাসনাদি হইল। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরেও স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া উপাসনা প্রার্থনাদি করিলেন। দুইদিন গত হইল, তৃতীয় দিন রবিবার। ব্রহ্মর্ষি সে দিন আহারান্তে বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে গেলেন। বাটীতে তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনীকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে বলিলেন। সে সময় তাঁহার গৃহে চাকর চাকরাণী কেহই থাকিত না, তিনি খুব অসুবিধার মধ্যেই বাস করিতেন। বাড়ী তখনো সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় নাই, এক তলায় দুইটিমাত্র ঘর হইয়াছে, তাহার একটি ঘরের কপাটাদি সব হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি বাটীর বাহির হইয়া গেলে মেয়েরা সেই একটি গৃহে দ্বারবদ্ধ করিয়া রহিলেন। এ দিকে ব্রহ্মর্ষির জ্ঞাতিরা সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া কয়েক জন বলিষ্ঠ যুবার সহিত পিছনের বাগানের পথ দিয়া ব্রহ্মর্ষির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে নিঃশব্দে আসিয়া একটি বালককে শিখাইয়া দিলেন যে, “তুমি ‘চাবি চাহিতেছেন’ বলিয়া মেয়েদের ডাক।” সেই কথামত বালক দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল। ব্রহ্মর্ষির ভগিনী বালকের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া যেমন দরজা খুলিয়া দিলেন, অমনি দশ পনেরো জন লোক সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষির বিধবা ভাগিনেয়ীকে ধরিয়া দ্রুতপদে পুরাণো বাড়ীতে লইয়া গেল। সারদা বাবু প্রভৃতি কয়েকজন ভগিনীকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কোন মতেই যাইতে সম্মত হইলেন না। সারদাবাবু ভগিনীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, পরিশেষে পায়ে পরিলেন; কিন্তু কিছু-

তেই তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না। তখন সারদা বাবুরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি ত আর বালিকা নহেন, বলপ্রকাশে বাধা দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে ধরিয়া রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার চীৎকারে রাস্তায় লোকারণ্য হইল, কিন্তু কেহই তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। সেই নির্দ্দয় দস্যুর মত লোকগুলা একটি স্ত্রীলোককে টানিয়া হিঁচড়িয়া লইয়া যাইতেছে, আর সেই নিরপরাধা কুলাঙ্গনা অপমানে, ভয়ে লজ্জায় মনকষ্টে ও যন্ত্রণায় কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, টানাটানিতে তাঁহার বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং কেশ আলুলায়িত। বহু দর্শক একান্ত হৃদয়বিহীন হইয়াই উহা দেখিতেছে ও শুনিতেছে। সে দৃশ্য দর্শনে এবং সে আর্ত্তনাদ শ্রবণে তাহাদের কাহারো প্রাণে একটুও আঘাত লাগিল না! দেশাচারের এমনি প্রভাব! দেশাচার মানুষকে একেবারে অন্ধ করিয়া দেয়, তাহাদের হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে। ধর্ম্মকে অধর্ম্ম করিয়া দেয়, অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করায়, এই দেশাচারের অধীন হইয়া এতগুলি লোক অনায়াসে এই নিষ্ঠুর ব্যাপার সহ্য করিল, কোন নির্দ্দোষ পুরুষকে যদি কেহ এইরূপ নির্দ্দয় রূপে রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে দর্শকেরা নিশ্চয়ই উহাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া যাইত; কারণ, সেখানে তাহাদের হৃদয়বৃত্তির উপরে দেশাচারের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু এখানে দেশাচার তাহাদের অন্তঃকরণের উপর এমন একটি কঠিন পরদা ফেলিয়া রাখিয়াছে যাহা ভেদ করিয়া অসহায়া অবলার করুণ আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিতে পারিল না।

ব্রহ্মর্ষি বালিকা বিদ্যালয়ে নিশ্চিন্ত মনে পড়াইতেছেন, এ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল না, কে সংবাদ দিবে? পাপ দেশাচার সে পথও

রুদ্ধ করিয়াছে। যথাসময়ে গৃহে আসিয়া ব্রহ্মর্ষি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়াই মর্ম্মাহত হইলেন, এবং স্থিরভাবে ইতিকর্ত্তব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ২৯শে জুন তারিখে এই ঘটনা হয়। সে দিন সন্ধ্যাকালে গ্রামস্থ ব্রাহ্মগণ সামাজিক উপাসনার জন্য ব্রহ্মর্ষির গৃহে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশের জন্য নালিশ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষি চিরদিনই আদালতের আশ্রয় গ্রহণের বিরোধী এবং ভগবানের কৃপাপ্রার্থী, সুতরাং তিনি তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া ঈশ্বরের কৃপার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ও দিকে তাঁহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ী একটি ঘরে চাবিবদ্ধ রহিলেন। উৎপীড়ন নির্য্যাতন তাঁহাদের উপর যথেষ্ট হইতে লাগিল। পরে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা আনিতে লোক পাঠানো হইল। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও তাঁহারা সমাজে গৃহীত হইতে পারেন না—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্যবস্থা দিলেন। তাঁহাদের অপরাধ ব্রহ্মর্ষির বাটীতে ত্রিরাত্রি বাস; সুতরাং নির্জ্জন বাসের জন্য তাঁহারা কাশী প্রেরিত হইলেন। যে কয়দিন তাঁহারা বাটীতে গৃহমধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময়ে অপর কেহ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখন তাঁহারা একজন অপরিচিত তীর্থযাত্রী সঙ্গীর সহিত দূর তীর্থে প্রেরিত হইলেন। (১৮৬৮ সালের ২৬শে জুলাই)।

বরাহনগরের একজন ব্রাহ্মণ কাশীবাসী ছিলেন, তাঁহার নাম কালীনাথ মৈত্রেয়। ব্রহ্মর্ষির ভগিনী ও ভাগিনেয়ী তাঁহাদের বাটীতেই রক্ষিত হইলেন। তাঁহারা যে বরাহনগর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, ব্রহ্মর্ষি শুধু ইহাই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় প্রেরিত হইয়াছেন তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। নানা লোকে নানারূপ গুজব রটাইতে লাগিল। কেহ

বলে বৃন্দাবনে গিয়াছেন, কেহ বলে কাশী গিয়াছেন, কেহ বলে তাঁহারা কুসুমের (ব্রহ্মষির ভাগিনেয়ীর নাম কুসুমকুমারী) পিতার নিকট গিয়াছেন। অবশেষে ব্রহ্মষি নিশ্চিত সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহারা কাশীতে কালীনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের বাটীতে আছেন। তখন তিনি কাশীর তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু লোকনাথ মৈত্রেয়কে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিলেন যে তাহার ভগিনী ভাগিনেয়ী কিরূপ অবস্থায় আছেন, এবং সেখানে গেলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে কিনা? তাহার উত্তর আসিল যে, "সাক্ষাৎ হইতে পারে।" এই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মর্ষি স্থির হইয়া রহিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। উহার অল্পদিন পরেই পূজার বন্ধ আসিল। ব্রহ্মর্ষি বিদেশ ভ্রমণের আয়োজন করিলেন। যেদিন তাঁহার আপীষ বন্ধ হইল, সেইদিন (১৯ শে সেপ্টম্বর) রাত্রে মৈল ট্রেনে তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। ২১ শে তারিখ কাশী গিয়া পৌছিলেন। যাহাতে তাঁহার এই কাশী যাত্রা কেহ জানিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন। কাশীতে গিয়াই তিনি ডাঃ লোকনাথ মৈত্রেয়ের বাড়ি যাইবার জন্য একখানি গাড়ি ভাড়া করিলেন, এবং গাড়িতে উঠিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। গাড়ি লোকনাথ বাবুর বাড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্মর্ষি নামিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বাবু তখন উপরে আছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনিও উপরে চলিলেন। ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা। ঠিক সেই সময়েই ব্রহ্মষির ভগিনী তাঁহার কন্যাসহ সেইস্থানে উপস্থিত! তাঁহারা লোকনাথ বাবু দ্বারা ব্রহ্মর্ষিকে পত্র লেখাইবার জন্য তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অবশ্য নিজেরাই পত্র লিখিতে পারিতেন, তবে অপরের দ্বারা পত্র লেখাইবার কারণ কি? এতদিন ব্রহ্মষির কোনো সংবাদ না পাইয়া এবং এই বিপদের সময়ে

তাঁহার সাহায্যের কোনরূপ চেষ্টা না দেখিয়া তাঁহারা ব্রহ্মর্ষির সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি যে তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন। তিনি পত্র লিখিলে তাঁহারা পাইবেন না এবং তিনি যে তাঁহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন ইহা প্রকাশ হইলে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়াই ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদিগকে কোন পত্রাদি লেখেন নাই ব্রহ্মর্ষি উপরে উঠিয়াই সম্মুখে তাঁহাদের দুজনকেই দেখিতে পাইলেন। এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার নিদর্শন পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া ভগবানের চরণে সংলগ্ন হইতে চাহিল। তাঁহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ী হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন; এবং চিত্তাবেগ প্রশমিত করিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিবার পর ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,—"তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?" তাঁহারা বলিলেন, "যাবো", ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁহারা তিনজনে কাশী হইতে যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া পশ্চিমগামী গাড়িতে আরোহণ পূর্ব্বক ভগবানের করুণার জয় গান করিতে করিতে তাঁহারা এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ব্রাহ্মবন্ধু বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষের বাটীতে তাঁহাদিগকে রাখিয়া ব্রহ্মর্ষি দেশ ভ্রমণেচ্ছায় তথা হইতে বাহির হইলেন। যখন তিনি দিল্লীতে গিয়া পৌছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সপরিবারে ও সদলে শিমলা-শিখর হইতে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশবচন্দ্র লর্ড লরেন্স কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শিমলায় গিয়াছিলেন এবং সেখানে গিয়া, ব্রাহ্ম বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ

করাইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এদিকে গবর্ণমেণ্ট হইতে আইন পাশ করাইবার জন্ত ব্রহ্মানন্দ শিমলায় গিয়াছিলেন, ও দিকে ব্রহ্মর্ষিও সেই আইনানুসারে বিবাহ দিবার যোগাড় করিতেছিলেন। দিল্লীতে ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সম্মিলনে তাঁহাদিগের সকলেরই অন্তরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। ব্রহ্মর্ষি তাঁহাদিগের সহিত দিল্লী হইতে লক্ষ্নৌ যাত্রা করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিন বন্ধু সহবাসে প্রীতিলাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি পুনরায় এলাহাবাদে আসিলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি লক্ষ্নৌ রহিলেন। ব্রহ্মর্ষির ছুটি শেষ হইয়াছি বলিয়াই তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি এলাহাবাদে আসিয়া ভগিনীও ভাগিনেয়ীকে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে রওনা হইলেন। তখন তথায়—রেলওয়ে আপীসের উচ্চ কর্ম্মচারী বাবু প্রসন্নকুমার সেন থাকিতেন। সেই সময়ে মুঙ্গেরে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং প্রসন্ন বাবুর সাহায্যে অনেকগুলি ব্রাহ্ম চাকরি পাইয়া সেখানে কাজ করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে প্রসন্নবাবু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হন। ব্রহ্মর্ষি তাঁহার আশ্রয়ে ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে রাখিয়া ৩রা অক্টোবর তারিখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। দেশে আসিয়া তিনি কলিকাতায় সুরতি বাগানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেই বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র লইয়া গেলেন। ব্রহ্মর্ষি সপরিবারে কলিকাতা বাসী হইলেন। কেবল প্রতি শনিবার সমাজ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য বরাহনগরে যাইতেন। ইহার অল্পদিন পরেই জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে মুঙ্গেরে গিয়া ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে লইয়া ১১ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় আসিলেন। বিধাতার কৃপায় তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হইল। তাঁহাদের গৃহে ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। অল্পদিন পরেই ব্রহ্মর্ষি কুসুমকুমারীর (তাঁহার ভাগিনেয়ী) বিবাহের এক সম্বন্ধ স্থির

করিলেন। পাত্র উত্তর বরাহনগর নিবাসী বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী, তিনি জাতিতে সদ্‌গোপ। তাঁহার পিতা বরাহনগরে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার দানশীলতার কথা এখনো বরাহনগরের লোকেরা ভুলে নাই। পাত্র শিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী। তৎকালে তিনি বিপত্নীক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষির এই প্রস্তাবে চন্দ্রনাথ বাবু সম্মত হইলেন, ব্রহ্মর্ষির ভগিনী এবং ভাগিনেয়ীও সম্মতা হইলেন, তখন হইতে পাত্র ও পাত্রীর পরস্পর সাক্ষাতাদি হইতে লাগিল। তৎপরে উভয়ের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে ১৮৬৮ সালের ২১ শে নভেম্বর বিবাহের দিন স্থির হইল। এবং উহার আয়োজনও হইতে লাগিল। বিবাহের জন্য মাণিকতলায় পুলের উত্তরে একটি বাগান বাটী স্থির করা হইল। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এবং বাঙালী বন্ধু বান্ধবের নিকট পাঠানো হইল। উক্ত নিমন্ত্রণ পত্রের একখানি প্রতিলিপি এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

"নিবেদন মিদং

আগামী ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বরাহনগর নিবাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহিত আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেবীর শুভ বিবাহ হইবে। আপনি উক্ত সময়ে মাণিকতলা পুলের উত্তর মুরারীপুকুর লেনের প্রথম উদ্যানের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনাদি করত শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করাইবেন ইতি।

৫ই অগ্রহায়ণ
১৭৯০ শকাব্দ } শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপরিউক্ত নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা বহুসংখ্যক লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল। বিবাহের সব স্থির, এমন সময়ে যাঁহাদের বাগান বাটীতে বিবাহ হইবার

কথা, তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বদিন ঐ বাড়ি দিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগের আত্মীয় স্বজনগণ আপনাদিগকে বাড়িদিতে নিষেধ করিতেছেন। সুতরাং আমরা আপনাদিগকে বাড়ি দিতে পারিব-না। কি ভয়ানক কথা! বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, নিমন্ত্রণ পত্র গিয়াছে, কল্যই বিবাহ। এমন সময়ে এই বিবাদ উপস্থিত! ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি তাঁহাদিগকে অনেক বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ইহাতে ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইদিন বিবাহ হইল না ইহা লিখিয়া প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের বাটিতে পাঠাইলেন। ডাঃ ওয়াল্‌ডি সাহেব এই সংবাদ শুনিয়া এদেশীয় লোক-দিগের কুসংস্কার ও স্বভাব চরিত্রের নিন্দা করিয়া ব্রহ্মর্ষিকে এক পত্র লিখিয়া ছিলেন। এই ব্যাবাতে ঐ দিনে আর বিবাহ হইল না, তাহার পরের শনিবার পুনরায় বিবাহের দিন স্থির হইল। এবার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এক রাত্রির জন্য ৬০ টাকা ভাড়ায় একখানি বাড়ি স্থিরীকৃত হইল। ইংরাজী ১৮৬৮ সালের ২৮শে নভেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে উক্ত বাটীতে বিবাহ হইবে এইরূপ নিমন্ত্রণ পত্র পুনঃপ্রেরিত হইল। মহা সমারোহে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। বিবাহের দিন উপস্থিত, বিবাহ বাটী সুন্দররূপে সজ্জিত হইল, পত্রপুষ্পমালায় উৎসবগৃহ সুশোভিত ও আলোকিত হইয়া সন্ধ্যাকালে উজ্জ্বল আলোকমালায় সমস্ত বাড়ি আলোকিত হইয়া উঠিল। দলে দলে নিমন্ত্রিতগণ আসিতে লাগিলেন। দর্শক আগন্তুক এবং নিমন্ত্রিতগণে বাটী পূর্ণ হইল সম্ভ্রান্ত ইংরেজ নরনারীগণ সভামধ্যে আসীন হইলেন। যথা সময়ে বিবাহের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভগবানের প্রেমলীলা দুইটি নরনারীতে সঞ্চারিত হইল। যে হতভাগ্য রমণী প্রেমের শুষ্কতায়

কঠিন হইতে ছিল, ঈশ্বর কৃপায় আজ তাহার অন্তরে পবিত্র প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইল। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ আনন্দে এবং ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া এই গানটি গাইলেন,—"তোমারি করুণায় নাথ সকলই হইতে পারে, অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতসম বাধাবিঘ্ন যায় দূরে।" ইত্যাদি। বাস্তবিক ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত।

এই ভাবে নানা স্থানে বিবিধ উপায়ে দীর্ঘকাল সেবাব্রত মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এখনও এই জীবনের সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজের হিতের জন্য প্রার্থনা ও চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি নিজ জীবনে ব্রহ্মের কৃপার জয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এখনকার প্রার্থনা প্রতিগৃহে প্রতি জীবনে ব্রহ্ম-কৃপায় এবং ব্রহ্মনামের জয় হউক।

মনের বল

চিন্তাই সকল সাধনার মূল, চিন্তার বিকাশই সিদ্ধিলাভের উপায়। এক মহাশক্তি যেমন জগতের নানা বিভাগে বিভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছে, চিন্তাও সেইরূপ এক হইয়াও বিভিন্ন মানবহৃদয়ে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে সকল বিভাগেই কার্য্য করিতেছে। ধর্ম্মসাধন, যোগ, তপস্যা, রাষ্ট্র-পরিচালন, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ব্যাপারের মূলেই চিন্তা। যে কোন বিভাগেই হউক না কেন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলেই তাহাকে চিন্তাশীল হইতে হইবে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, কবি, রাজনীতিবিশারদ, শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই চিন্তাশীল। মানবমণ্ডলীর মধ্যে এই চিন্তার বিকাশ যাঁহাতে যে পরিমাণ হইয়াছে, তিনি অভীষ্ট বিষয়ে সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মানব-মনই চিন্তার আধার। মনোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও ক্রমশঃ বিকশিত হয়। চিন্তার সম্যক্ বিকাশের জন্য চাই সুস্থ শরীর, ও সবল মন, একাগ্রতা, দৃঢ়বিশ্বাস এবং সাধননিষ্ঠা। নির্জ্জন সাধনে চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয় এবং একাগ্রতা বাড়ে। গভীর রাত্রিতে নির্জ্জনে অনন্যমনা হইয়া অভীষ্ট বস্তুর ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে মনের দৃঢ়তা ও চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তজ্জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন, শিল্প ধর্ম্ম প্রভৃতি যে কোন বিভাগের চিন্তাশীল সাধকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য নির্জ্জন স্থান ও নিশীথ রাত্রিকে সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ও সময় বলিয়া অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া থাকেন।

নিশীথ রাত্রি অথবা নির্জ্জন স্থান না হইলে কবির কবিত্ব তেমন ফুটে না। নির্জ্জন উদ্যানে বসিয়াই প্রথম নিউটনের মনে মাধ্যাকর্ষণের চিন্তা জাগিয়াছিল ; পরে সেই চিন্তার বিকাশেই মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার।

দেবালয়প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মর্ষি শশিপদর জীবনে আমরা এই চিন্তার বিকাশ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই। রাত্রি ৩টার, সময় জাগিয়া চিন্তা ও সাধন করা তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। এইরূপ অভ্যাসেই তাঁহার চিন্তা সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই বিকশিত চিন্তার ফলেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন,— "চিন্তাই মানুষকে স্বর্গে লইয়া যায়। চিন্তাই জগতের সকলপ্রকার আবিষ্কারের জননী ; চিন্তার সন্তান অধ্যবসায় ও ব্যাকুলতা। চিন্তা মনোরাজ্যের রাণী হইয়া বসিয়া আছেন। সকল দিকেই তাঁহার রাজ্য। ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, শিশু যুবক ও বৃদ্ধ সকল মানুষই তাঁহার প্রজা। যে প্রজা বা সাধক চিন্তার অনুগত—বশীভূত হইয়াছেন, তিনিই রাণীর প্রসাদে বাঞ্ছিত উন্নতি লাভ করিয়া ধন মান যশ, স্বর্গ ও শান্তিসুখ পাইয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চিন্তার বিকাশের জন্য সুস্থ ও সবল মন একান্ত আবশ্যক। মনের বল যাঁর যত বেশী, চিন্তার বিকাশও তাঁর সেই পরিমাণে বেশী হইয়া থাকে। চিন্তার বিকাশের পক্ষে শরীরের বল অপেক্ষা মনের বলই সমধিক প্রয়োজনীয়। যাহাদের মনে বল নাই, তাহাদের মানসিক সদ্বৃত্তিনিচয় কিছুতেই সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। রাজা প্রজা, আত্মীয় স্বজন, সৈন্য সামন্ত কেহই অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিগুলিকে রক্ষা করিতে পারে না এবং অসদ্বৃত্তিগুলাকেও তাড়াইতে পারে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিতে

হইলে প্রচুর মানসিক বলের প্রয়োজন; যথেষ্ট মনের বল না থাকিলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। শারীরিক বলের দ্বারা অন্তরের রিপুগুলাকে বশীভূত করা যায় না। যাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহারা বরাবরই অন্তরের রিপুদিগের নিকট পরাস্ত; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের উপর যথেচ্ছ প্রভুত্ব করিয়া থাকে; তজ্জন্য তাহারা বিবিধ কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক জ্ঞানী গুণী লোকও এই কু-অভ্যাসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। মানসিক দুর্ব্বলতাই ইহার একমাত্র কারণ। একটি কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাই যে কত কঠিন, তাহা প্রোফেসর ম্যাক্‌সমূলার ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রাজকবি টেনিসনের সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তদ্বারা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। একখানি বিলাতী সংবাদ-পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"একদা রাজকবি টেনিসনের বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে তামাকের ধূমপান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। (টেনিসন্ খুব ধূম পান করিতেন) টেনিসন্ তাহা শুনিয়া হাস্যমুখে উত্তর করিলেন,—"আঃ! এ আর একটা কঠিন কথা কি! এ তো সকলেই পারে!" তাঁহার বন্ধুগণ বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে আপনি পরিত্যাগ করুন দেখি," এই বলিয়া তাঁহারা টেনিসন্‌কে বিশেষ ভাবে উপরোধ করিলেন। তখন টেনিসন্ "আচ্ছা, আজ থেকেই আমি তামাক ছাড়্‌লুম্"—এই বলিয়া তাঁহার ধূমপানের পাইপ্ জানালা দিয়া বাহিরে তাঁহার উদ্যানে ফেলিয়া দিলেন।

তাহার পরদিন সকলে দেখিল, রাজকবির আর সে প্রফুল্লতা নাই। দ্বিতীয় দিনও তিনি অতি বিষণ্ণ এবং 'খিট্‌খিটে' হইলেন। তৃতীয় দিন তাঁহাকে দেখিয়া সকলে উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু টেনিসন্ আর থাকিতে পারিলেন না। সে দিন সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর প্রত্যূষে

উঠিয়া তাঁহার সেই ফেলিয়া দেওয়া পাইপ্‌টি খুঁজিতে গেলেন; পরে উহা পাইয়া দেখিলেন যে, পাইপ্‌টির নলের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি সেই ভাঙা পাইপ্‌ই ঘরে লইয়া আসিলেন। প্রাতঃকালে সকলে তাঁহাকে বেশ সুস্থ এবং হৃষ্টচিত্ত দেখিতে পাইল। 'এই ঘটনার পর আর কেহ কখনো টেনিসন্‌কে তামাক পরিত্যাগ করিতে বলে নাই।"

অঙ্গীকার রক্ষা করিতে এবং কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রচুর মানসিক বলের প্রয়োজন। এই জন্যই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা এই মানসিক বলে বলীয়ান্‌, তাঁহারাই জগতে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লোকহিতকর মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদর যদি এই মানসিক বল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই এই কু-সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের বিবিধ কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিতেন না। যেমন বড় বড় যুদ্ধে বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে বীর জয়ী হইতে পারেন তাঁহার শারীরিক বলের প্রশংসা সকলই করেন, সেইরূপ যিনি বহু কু-পথগামী ব্যক্তিকে সুপথে আনিতে পারেন, পাপের আকর্ষণে নিজে আকৃষ্ট না হইয়া তাহাতে নিমজ্জমান ব্যক্তিদিগকে উত্তোলন করিতে পারেন, তাঁহার মনের বলও তদপেক্ষা শতগুণে প্রশংসনীয়। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ একাকী এই মহাসমরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক্‌ হইতে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিরাকরণ করিয়াছেন এবং অনেকের হস্ত হইতে কুসংস্কার-চর্ম্ম, সুরা-বিষাস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া ভদ্রবেশ গ্রহণ করাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড় কঠিন কর্ম্ম। ব্রহ্মর্ষি শশিপদ ২৪ বৎসর বয়সের সময় কেমন করিয়া কত সহজে একটি কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। যে সময় তিনি সুরাপাননিবারণী সভা স্থাপন করিয়া দেশ হইতে

সুরাবিষ দূরীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহার প্রথম অবস্থায় তিনি খুব তামাক খাইতেন। সেই সময়ে তামাক খাওয়া যে কিছুমাত্রও দোষের কাজ, ইহা কাহারো মনেই স্থান পাইত না। তখন দেশের মধ্যে সুরাপান পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছে। এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে 'সুরাপান'কে ভয়ানক পাপকার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছে। শাস্ত্রকারগণ সুরাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তখন সুরাপান শাস্ত্রোক্ত নিষেধের বাঁধ ভাঙিয়া দেশ ভাসাইয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে; সুরাপায়ী আর সমাজচ্যুত হ'ন না, তৎকালীন বঙ্গসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ঘোর সুরাপায়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবু প্যারীচরণ সরকার, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লোকহিতৈষী মহাত্মাগণ যদি সুরাপানের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমের সহিত আন্দোলন উপস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে এ দেশের আরো যে কত দুরবস্থা হইত তাহা এখন কল্পনা করাও কঠিন। তখন শশিপদ বাবু প্রধান উদ্যোগী হইয়া কয়েক জন বন্ধুর সহিত সুরাপায়ীদিগের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি কাশীপুরে বংশীধর মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়াছেন। বংশীধর বাবু তখন সুরাপানজনিত কঠিন ব্যাধিতে শয্যাগত, জীবনের আশা নাই। শশিপদ বাবু বংশীধর বাবুকে দেখিতে গিয়া সেস্থানে সমাগত আরো কয়েকটি লোকের সহিত সুরাপানের দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কয়েক জন বলিলেন,—"মহাশয়, বহুদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন!" শশিপদ বাবু সে সময়ে তামাক খাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—"কঠিন আর কি, ইচ্ছা থাক্‌লেই পারা যায়।" তাঁহারা বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি কি এই তামাক খাওয়া সহজে ছাড়্‌তে পারেন?" শশিপদ বাবু "পারি!" বলিয়া হাতের হুঁকা রাখিয়া বলিলেন,—"আজ হ'তে এই তামাক

খাওয়া ছাড়্লুম!" শশিপদ বাবু সেই যে তামাক পরিত্যাগ করিলেন জীবনে আর কখনই তামাক স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কয়েক জন তামাক ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আবার কয়েক দিন পরে তামাক আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে শশিপদর মনের অসাধারণ বল প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ মনের বল আছে বলিয়াই তিনি কোনো কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। যাঁহাদের মন দুর্ব্বল তাঁহাদিগকে কি সৎ কি অসৎ সকল দিকেই ফিরানো যায়। তাঁহারা আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া বহুদিন দাঁড়াইতে পারেন না; চিরদিনই তাঁহাদিগকে পরের বলের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। দেশে এইরূপ মানসিক বলের প্রাধান্য হইলেই দেশের মঙ্গল। যে দেশের অধিকাংশ লোক এইরূপ মানসিক বলে বলীয়ান্, সেই দেশ সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইতে থাকে।

শশিপদ বাবুর মানসিক বলের আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার পরম বন্ধু মিস্ কার্পেণ্টারের বাটীতে ছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টার শশিপদ বাবুর পরম হিতৈষিণী। তাঁহারই যত্নে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহার গৃহে সপরিবারে অতি সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন। তা ছাড়া, আরো নানা প্রকারে তিনি শশিপদ বাবুর উপকার করিয়াছেন। সেই সময়ে মিস্ কার্পেণ্টারের বাড়ীতে শশিপদ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার অ্যাল্বিয়ানের জন্ম হয়। সেই পুত্রের জাতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার শশিপদ বাবুকে বলিলেন,—"তোমার পুত্রের জাতকর্ম্ম আমার পিতার ভজনালয়েই হইবে এবং সেই ভজনালয়ের আচার্য্য জেম্স্ সাহেব আচার্য্যের কার্য্য করিবেন।" এই কথা শুনিয়া শশিপদ বাবু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তাহার কারণ, তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, পুত্রের জাতকর্ম্ম উঁহাদের ভজনালয়ে

উঁহাদের পুরোহিত দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; এ দিকে মিস্ কার্পেণ্টারের অনুরোধ, তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন,—"হাঁ, উপাসনা হবে, তবে আপনার বাটীতেই মিষ্টার টমাস (কার্পেণ্টারের ভগিনীপতি) আচার্য্যের কর্ম্ম করবেন।" মিস্ কার্পেণ্টার অতিশয় তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, তিনিও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। পরে বলিলেন,—"তোমার এই উত্তরে, তোমার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আমার আরো বেড়ে গেল!" এ স্থলেও শশিপদ বাবুর মানসিক বলের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মিস্ কার্পেণ্টারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ মতানুযায়ী অভিপ্রায় ব্যক্ত করা, দুর্ব্বলচিত্তের সাধ্য নহে।

প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকটে কিছুই অসম্ভব নহে। বিশ্বাসীর ফুৎকারে সকল বাধাবিঘ্ন কোথায় উড়িয়া যায়। শশিপদ বাবু এই কথা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন এবং অনেক কার্য্যে তিনি এই কথায় যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, শত সহস্র বাধা এবং অনতিক্রমণীয় বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। বরাহনগরে যখন যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতেই নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এমন কার্য্যই নাই যাহা তিনি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। তিনি যে কিরূপ দৃঢ়তার সহিত সেই সকল বিপুল বিঘ্ন দুরীভূত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। এ স্থলে তাঁহার সেই দৃঢ়বিশ্বাস এবং অদম্য মানসিক বলের একটি উদাহরণ দিতেছি।

একদা মিস্ মেরী কার্পেণ্টারকে বক্তৃতা করিবার জন্য বরাহ নগরে নিমন্ত্রণ করা হয়। বরাহ নগরের কোনো গণ্যমান্য ভদ্রলোকের

প্রাঙ্গনে তাঁহারই সম্মতিক্রমে সভার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু সভার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে উক্ত ভদ্রলোক শশিপদ বাবুকে বলিলেন, 'আমার বাটীতে স্থান হইবে না।' এই কথা শুনিবামাত্র শশিপদ বাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; কারণ, তৎপর দিনই আসিবার জন্য কুমারী কার্পেণ্টারকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। মিস্ কার্পেণ্টার তখন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্সের বাটীতে ছিলেন। পরদিন তিনি স্বয়ং তাঁহাকে আনিতে যাইবেন। কিন্তু কোথায় আনিবেন?—তাঁহার যে স্থান নাই। সেই সময়ে শশিপদ বাবু স্থানাভাবের জন্য হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। তৎপরে বহুকষ্টে এক পাঠশালায় সভার স্থান স্থির করিলেন। কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ কুমারী কার্পেণ্টারকে আনিতে শশিপদ বাবু নিজে যাইতে পারিলেন না; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পাঠাইলেন। ১৮৬৭ সালের ৬ই জানুয়ারি কুমারী কার্পেণ্টার বরাহ নগরে বক্তৃতা করিতে আসেন। সেই বক্তৃতার পরেই সেই সভাতেই শশিপদ বাবু 'সামাজিক-উন্নতিবিধায়িনী সভা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শশিবাবু সাধারণ সভা সমিতির স্থানাভাবের জন্য অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিয়াছিলেন। সেই আঘাত পাইয়াই একটি সাধারণ গৃহ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি অন্তরে অন্তরে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে তিনি কুমারী কার্পেণ্টারকে পত্রের দ্বারা তাঁহার এই সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ঐ 'সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী' সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নিকট একটি সাধারণ গৃহের আবশ্যকতা জানাইয়া একটি প্রস্তাব করেন। আড়াই শত টাকা সংগৃহীত হইলে একখানি বাংলো ঘর প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা হইলে স্থানীয় একটি প্রধান অভাব মোচন হয়। কিন্তু ঐ টাকা সংগ্রহ করা কমিটির নিকট অতি অসম্ভব

বলিয়া বিবেচিত হইল। শশিপদ বাবু ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ ইহাতে নিরাশ হইল না। তিনি দ্বিগুণ আশা ও উৎসাহের সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার ধ্রুববিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে কর্ত্তব্য বোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যতই কেন বাধা আসুক না অন্তরের উৎসাহানলে শুষ্ক তৃণের ন্যায় সকল বিঘ্ন বিপত্তি ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। এই কারণেই তিনি কমিটির সিদ্ধান্তে পশ্চাৎ পদ হইলেন না। তিনি তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে সাধারণের নিকট এক আবেদন-পত্র বাহির করিলেন। তাহার ফলে একশত বায়ান্ন টাকা স্বাক্ষরিত হইল। তখন শশিবাবু আর একবার সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে ঐ প্রস্তাব করিলেন। পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও তাহাতে কোন ফল হইল না।

এ দিকে শশিপদ বাবু অন্য চেষ্টা দেখিতেছিলেন। তিনি 'বর্ণিত' কোম্পানীর অধ্যক্ষ সাহেবকে প্রস্তাবিত বিষয়ে সাহায্যদানে উৎসাহিত করিলেন। কলের অধ্যক্ষ কলবাটীর মধ্যে নাইট্ স্কুলের জন্য একটি সুন্দর বাংলো ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাহাতে সাধারণ সভা সমিতির স্থানের অভাব দূরীভূত হইল। নৈশ বিদ্যালয় নিয়মিত রূপে সে স্থানে হইতে লাগিল। সাধারণ লাইব্রেরীও সেখানে গেল। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় গৃহের অভাব থাকিয়াই গেল; কারণ, কলবাটীর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের এই অসুবিধা কিছুদিন পর্য্যন্ত ছিল, পরে শশিপদ বাবু ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই অভাব মোচনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি নিজ বাটীর সম্মুখে এরূপ একটি হল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন—যাহাতে বালিকা বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, সভা সমিতি প্রভৃতি

সাধারণ সকল প্রকার কার্য্যই অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে। এ কথা বার বার বলা হইয়াছে যে, শশিপদ বাবুর সঙ্কল্পিত কার্য্য কোনোরূপ বাধা বিঘ্নে কখনই অসম্পন্ন থাকে না। এই বিপুল ব্যয়সাধ্য সাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যে তিনি সেই মঙ্গলময়ের নাম স্মরণ করিয়া নিজের জমিতেই ঐ গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই গৃহনির্ম্মাণের জন্য সহৃদয়া কুমারী মেরী কার্পেণ্টার অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে শশিপদ বাবু শিক্ষাদির উন্নতির জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এবং তাঁহার অন্যান্য কয়েকটি বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাই তিনি ঐ গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন কি আশ্চর্য্য! এ কার্য্যেও তাঁহাকে বিপক্ষতাচরণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি যখন ইংলণ্ডে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দেশীয় কোনো বন্ধু ইংলণ্ডে থাকিয়া এই অর্থসংগ্রহের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহার সহায়, কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে? যাহা হউক হল নির্ম্মাণ করিতে শশিপদ বাবুকে নিজ হইতে অনেক টাকা দিতে হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন রবিবার ঐ হলের (Institute hall) ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সালে শশিপদ বাবু যে সাধারণ গৃহের জন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছিলেন; যাহার অভাবে অন্তঃকরণে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, আজ আট বৎসর পরে সেই গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। আজ শশিপদ বাবুর কি আনন্দের দিন! আজ বহুদিনের বাঞ্ছিত বহুদিনের সঙ্কল্পিত প্রিয় Institute hall-এর ভিত্তি স্থাপনের দিন। শ্রমজীবীরা সকলে উপস্থিত, গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা ক্রমে ক্রমে সকলে সমবেত হইলেন। সমারোহ খুব, কিন্তু বড়লোক নাই। এ সকল কার্য্যে এখন য়ুরোপীয় প্রথানুসারে যে পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, শশিপদ বাবুর নবোন্মেষিণী বুদ্ধি তাহা

গ্রহণ না করিয়া নূতন প্রণালীতে তাহা সমাধা করিতে তাঁহাকে প্রস্তুত করিল। তিনি ইচ্ছা করিলে বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্ণরকে এই ভিত্তি স্থাপনের জন্য আনিতে পারিতেন; কিন্তু এই অনুষ্ঠানে তিনি কোনো বড়লোককে নিমন্ত্রণ করেন নাই। প্রথমে মঙ্গলবিধাতা পর-ব্রহ্মের উপাসনা, পরে সমবেত শ্রমজীবীদলের সহিত ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিয়া স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব ও সমবেত শ্রমজীবীদলের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মর্ষি শশিপদ উক্ত গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। শ্রমজীবিগণ সকলেই এক এক করিয়া এই সাধারণ মঙ্গলগৃহের ভিত্তিতে ইষ্টক স্থাপিত করিয়া ভাবী গৃহের উপর সাধারণ স্বত্ব সংস্থাপন করিল। এ স্থলেও শশিপদ বাবুর নূতনত্ব! কে কোথায় সাধারণ লোকের দ্বারা ভিত্তি স্থাপন করাইয়া থাকে? সকল কার্য্যের মধ্যেই শশিপদ বাবুর এইরূপ নবভাবোদ্দীপনা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে তিনি স্বয়ং উত্যক্ত বা নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই কার্য্যের মধ্যে কিছু না কিছু নূতনত্ব বিধান করিবেনই করিবেন।

ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে ইনষ্টিটিউট্‌-হল্‌ প্রস্তুত হইল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারি তারিখে এই সাধারণ গৃহের দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। শশিপদ বাবুর বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল। তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ সফলমনোরথ হইয়া শ্রমজীবীদিগের কল্যাণসাধনে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। তিনি এইরূপে কায়মনোবাক্যে ও অর্থের দ্বারা শ্রমজীবীদিগের অশেষ প্রকার হিতসাধন করিয়াছেন। শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে কেহ কোনো বিপদে পড়িলে তিনি প্রাণ দিয়া তাহাকে সেই বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার গৃহে যাইয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন। কাহারো মৃত্যু হইলে তিনি তাহার স্ত্রীপুত্রাদির

ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। অত্যাচারের হস্ত হইতে শ্রমজীবী-দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন এ স্থলে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

একদা শ্রমজীবীরা পুলিশ-কর্ম্মচারীদিগের ভীষণ উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াছিল। বরাহ নগরের এক অতি দুর্বৃত্ত সুরাপায়ী পুলিশ-সব্‌ইনস্পেক্টর সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া এক দরিদ্র অনাথা শ্রমজীবী স্ত্রীলোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে; রাত্রিকালে ঐ স্ত্রীলোকটির গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আক্রমণ-পূর্ব্বক কনেষ্টবলদিগের দ্বারা গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া পাশববৃত্তি চরিতার্থ করে। সেই রাত্রিতেই কতকগুলি শ্রমজীবী শশিপদ বাবুর নিকটে এই লোমহর্ষণ সংবাদ দিল; তৎপরদিন ঐ স্ত্রীলোকটি শশিপদ বাবুর নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব বৃত্তান্ত বলিল। শশিপদ বাবু তাহা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং ঐ দুর্বৃত্ত সব্‌ইন্‌স্পেক্টরকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে আদালতে নালিশ করিতে বলিলেন। স্ত্রীলোকটি তাহাতে সম্মত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ সব্‌ ইন্‌স্পেক্টরের নামে সতীত্বনাশের অভিযোগ করিল। সব্‌ ইন্‌স্পেক্টর এই সংবাদ পাইয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের শরণাপন্ন হইল। গ্রামস্থ গণ্য মান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকে ঐ অসচ্চরিত্র সব্‌ইন্‌স্পেক্টরের পক্ষ হইয়া শশিপদ বাবুকে এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকিতে এবং ঐ সব্‌ইন্‌স্পেক্টরকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিলেন। দেশের কি দুরবস্থা! যে ব্যক্তি এইরূপ অত্যাচারী—বিশেষতঃ যাহার উপরে শান্তিরক্ষার ভার, যে এই সকল দুর্ব্বল দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্যই এ স্থানে নিযুক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির দ্বারাই দরিদ্র অবলার উপর এইরূপ

পাশবিক অত্যাচার! এরূপ নরাধম যাহাতে শাস্তি না পায়, এইরূপ ভাবে এখানে থাকিয়া দেশের লোকের ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করে, দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা তাহারই জন্য যত্নবান্; এ অবস্থায় দেশের উন্নতি কতদূর সম্ভবপর তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, শশিপদ বাবু কিছুতেই তাঁহাদের ঐ নীতিধর্ম্মবিগর্হিত অনুরোধ রক্ষা না করাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে সেই দুরাচার সব্ ইন্স্পেক্টর কতকগুলি শ্রমজীবীর নামে (যাহারা তাহার ঐ কুকীর্ত্তির বিষয় সেই রাত্রিতেই শশিপদ বাবুকে জানাইয়াছিল) 'তাহারা মদ খাইয়া রাস্তায় গোলমাল করিতেছিল' বলিয়া এক মিথ্যা দরখাস্ত করিল। তাহাদের নামে শমন বাহির হইলে তাহারা সেই শমন হস্তে করিয়া শশিপদ বাবুর নিকট আসিল। তিনি তাহাদের শমনগুলি লইয়া তাহাদিগকে অভয় দিয়া বাড়ী যাইতে বলিলেন এবং তৎ পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঐ মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য কলিকাতা গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া প্রথমে ২৪ পরগণায় জজ্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ এই মোকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন এবং ইহার বিচার আলিপুরে না হইয়া যাহাতে বরাহ নগরে হয় তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন; কারণ, অতগুলি শ্রমজীবীর পক্ষে তাহাদের কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া আলিপুর কোর্টে যাইতে হইলে তাহাদিগকে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে। উহাদিগকে অনর্থক হয়রান্ করানই উক্ত সব্ ইন্স্পেক্টারের উদ্দেশ্য। তদনুসারে জজ্ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়া শশিপদ বাবুর হাতে দিলেন। শশিপদ বাবু সেই পত্র লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিলেন এবং ঐ মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত

বলিয়া জজ্ সাহেবের চিঠিখানি তাঁহাকে দিলেন। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সেই স্থানেই তাঁহার আফিসের বেলা হইয়া গেল; সুতরাং তথা হইতেই তিনি অনাহারে আফিসে গেলেন। তাঁহার এই পরিশ্রম সার্থক হইল। শ্রমজীবীদিগের মোকদ্দমা যাহাতে বরাহ নগরে হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাই করিলেন। দুষ্ট সব্ ইন্স্পেক্টর শ্রমজীবীদিগকে ক্লেশ দিবার জন্যই ঐ মোকদ্দমা আলিপুর কোর্টে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শশিপদ বাবু তাহার সে সকল দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শশিপদ বাবু এত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও ঐ দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দেওয়াইতে পারিলেন না। গ্রামস্থ লোকের সহায়তায় আইনের কূটতর্কে ও অন্যায় বিচারে উক্ত সব্ ইন্স্পেক্টর সেই স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের অভিযোগ হইতে মুক্ত হইল বটে; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহার রায়ে উক্ত সব্ ইন্স্পেক্টরের অত্যাচার 'সত্য' বলিয়া এবং 'উহার কৃত' শ্রমজীবীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়া উল্লিখিত করিয়াছিলেন। এইজন্য সব্ ইন্স্পেক্টরকে অবিলম্বে স্থানান্তরে বদলি করা হইল।

মানুষের চরিত্র তিন প্রকার—অন্তশ্চরিত্র, বহিশ্চরিত্র, এবং উভয় চরিত্র। কাহারো অন্তশ্চরিত্র সুন্দর থাকে, কেহ বা বহিশ্চরিত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন; আবার কোনো কোনো মহাত্মা অন্তরে ও বাহিরে বিশুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ মানুষের বহিশ্চরিত্রই প্রকাশিত হয়—অন্তশ্চরিত্র প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে। পুস্তক প্রচারে, পরোপদেশে এবং পরোপকারক কার্য্যে অর্থাৎ বাহিরের সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকলাপে মানুষের বহিশ্চরিত্র প্রকাশ পায়; কিন্তু ইহাতে অন্তশ্চরিত্র জানা যায় না। যেমন কোনো ধনী লোক দূরদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া অনেক সৎ কাজ করিলেন এবং দীন দুঃখীদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতে লাগিলেন;

সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। স্তাবকগণ তাঁহার গুণগান করিয়া গ্রন্থ প্রচার করিলেন এবং সেই সময়ে উক্ত ধনী ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে বিবিধ উপাধি পাইয়া সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের খবর হয় ত অনেকেই জানেন না। তাঁহার এই অর্থ কি উপায়ে উপার্জ্জিত এবং তাঁহার অন্তরের অভিসন্ধিই বা কি তাহা অনেকেই জানিতে পারিলেন না। এইরূপ কত লোক শাস্ত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যাদ্বারা গবর্ণমেণ্ট হইতে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া নূতন কার্য্যের দ্বারা জগতে পরিচিত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের অন্তশ্চরিত্র কয়জন লোকে জানিতে পারে? তাঁহাদের অন্তর বিষময় কি অমৃতময়, দূর হইতে তাহা জানা যায় না। মরীচিকা দূর হইতে আপনাকে স্বচ্ছজলপরিপূর্ণ দেখাইয়া তৃষ্ণার্ত্তকে জলপানের আশা দেয়। পথিক উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নিজের ভ্রম বুঝিয়া দুঃসহ তৃষ্ণার জ্বালায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। ঈশ্বরপ্রেম দূর হইতে অতি নীরস ও কর্কশ বলিয়া বোধ হয়; এজন্য অনেকেই উহার নিকটর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করে না। অবিশ্বাসী কখনই উহার দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। বিশ্বাসী যতই উহার সমীপবর্ত্তী হইতে থাকেন ততই তিনি অমৃতরস পানে দিন দিন অধিকতর উৎসাহিত হন। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, ঈশ্বরের প্রেম এবং দয়া অনুভব করেন না, তাঁহা হইতে দূরে দূরে থাকেন, তাঁহাদের অন্তশ্চরিত্র গঠিত হয় না। পার্থিব যশোলিপ্সা বলবতী থাকিলে বহিশ্চরিত্রের দ্বারা দূরস্থ লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া অভীষ্ট ধন মান খ্যাতি লাভ করিতে পারা যায়। এই শ্রেণীর লোক তাঁহাদের অন্তরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না, সর্ব্বদা গোপনে রাখিতে চেষ্টা করেন; ইঁহারা মানুষ ভিন্ন আর কাহাকেও অন্তর্দ্দৃষ্টিকর্ত্তা দেখিতে পান না। মানুষকে ফাঁকি দিতে পারিলেই ইঁহারা স্বার্থসিদ্ধি অব্যর্থ মনে করেন। কিন্তু ভগবৎপ্রেমানুগত

ঈশ্বরপ্রেমিকের সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানেন না যে, আর সকলে দূরে থাকিলেও সেই অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ সর্ব্বদা অন্তরে আছেন। কিছু গোপন করিতে গেলেই তাঁহার প্রেমমুখ দেখিয়া তিনি লজ্জিত হন। এই সকল লোকেরই অন্তশ্চরিত্র সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকে।

দূরে থাকিয়া মানুষের অন্তশ্চরিত্র জানা যায় না, ইহা জানিতে হইলে নিকটবর্ত্তী হইতে হয়; অথবা সতত নিকটবর্ত্তী সচ্চরিত্রের নিকট জানিতে হয়। আমরা শশিপদ বাবুর অন্তর ও বাহিরের কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার উভয় চরিত্রের উৎকর্ষতা বুঝিতে পারিয়াছি এবং যাঁহারা তাঁহার সহিত সতত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাই তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রকাশ্য বাহিরের কার্য্যের পরিচয় এখানে আর কি দিব। বালিকা বিদ্যালয়, বয়স্কা রমণীদের জন্য বিদ্যালয়, শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয়, নীতি বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, মহিলাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর ও দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের কথা সর্ব্বজনবিদিত। তথায় অনেক ভদ্রমহিলা আশ্রয় পাইয়া বিদ্যালয়ে নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন, এবং নানাপ্রকার শিল্প ও গৃহ-কর্ম্মাদি শিক্ষা করিয়াছেন। এই সকল বিদেশীয় বিভিন্নরুচি বিভিন্ন সংস্কারবিশিষ্টা যুবতী, প্রৌঢ়া ও বালিকাদিগকে নিজ বাটীতে নিজ পরিবারবর্গের সহিত এক পরিবারভুক্ত করিয়া তাঁহারা যাহাতে সন্তুষ্ট চিত্তে ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষার অবসর পান তাহার ব্যবস্থা করা যে কত কঠিন, এবং তাহাতে অন্তঃকরণের যে কতদূর পবিত্রতা, প্রশস্ততা ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। ইহা হইতে শশিপদ বাবুর অন্তশ্চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বাটীস্থ সকল মহিলাই সতত তাঁহার সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিতেন, সকলেই

একবাক্যে তাঁহার স্নেহ যত্ন ও শিষ্টাচারের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহার দাস দাসীরাও কেহ কখনো তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই।

শশিপদ বাবুর চিত্ত এক পক্ষে অত্যন্ত কোমল, দেখিলে বোধ হয় যেন অতি মৃদুপ্রকৃতির; কিন্তু তাঁহার এই মৃদুতা সকল কার্য্যে নহে। যে কার্য্যকে তিনি নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া মনে করেন, তাহা নিবারণের জন্য দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও জ্বলন্ত উৎসাহের পরিচয় দিয়া থাকেন; তখন তিনি প্রকৃত তেজস্বী বীরের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত তাহা নিবারণ করিয়া তবে ক্ষান্ত হন।

শশিপদ বাবু যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন বরাহনগরের লোকেরা তাঁহার সম্মান ও যশের সংবাদ পাইয়া ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, শশিপদ বাবু ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া সেই অনলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বরাহনগরের সমস্ত লোকই তখন তাঁহার বিপক্ষ। কিরূপে তাঁহাকে সম্মানচ্যুত ও অপদস্থ করিবে, তথাকার অধিকাংশ লোকেরই তখন সেই চেষ্টা হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় সে সময় বরাহনগরে বাস তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কলিকাতাস্থ এবং বিদেশস্থ বন্ধুগণ বার বার তাঁহাকে বরাহনগরের বাস পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে তাঁহার পরম বন্ধু কুমারী কার্পেণ্টার এবং অন্যান্য ইংরেজ বন্ধুগণ তাঁহাকে বরাহনগর হইতে অন্যত্র গমনের জন্য পত্র দ্বারায় বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই সকল পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই;—

"আমরা ইচ্ছা করি আপনি ঐ স্থান হইতে অন্যত্র গিয়া বাস করুন। অন্য স্থানে গেলে আপনি সুখস্বচ্ছন্দে ও সম্মানের সহিত বাস করিতে

পারিবেন। ঐ স্থানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনার সকল শক্তি ব্যয়িত হইবে, অন্যত্র গমন করিলে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে কাজ করিতে পারিবেন।"

শশিপদ বাবু কিন্তু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না; একাকী এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিয়া বরাহনগরেই কার্য্যক্ষেত্র করিলেন। সেই সময়ে বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শশিপদ বাবু বরাহনগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে এতদূর অনিচ্ছুক ছিলেন যে, তিনি উক্ত উচ্চপদ অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বরাহনগরকেই তিনি নিজের কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া সেই অসংখ্য প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, কখনই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। ইহাতে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এ দেশের অনেক কৃতী পুরুষ অনেক স্মরণীয় কীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বিদেশে। স্বদেশে—জন্মস্থানে থাকিয়া এরূপ প্রতিকূলতার মধ্যে জয়ী হইয়া কেহ এরূপ কার্য্য করিতে পারিয়াছেন কি না জানি না।

একদা শশিপদ বাবু সপরিবারে কলিকাতার বাটীতে আছেন, তখনো বাটী প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয় নাই, সম্মুখের বারাণ্ডা বাঁশ দিয়া ঘেরা ছিল। মাঘোৎসবের অল্পদিন পূর্ব্বে একদিন শশিপদ বাবু তাঁহার বাটীর পশ্চিমে বিজয় বাবুর বাটীতে অনেক বন্ধুসহ মিলিত হইয়া ভোজন করিতেছেন। ভোজন প্রায় সমাপন হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, শশিপদ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুখতারা তেতালার বারাণ্ডা হইতে পড়িয়া গিয়াছে। এই বজ্রপাত সদৃশ নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কেবল শশিপদ বাবুই অতি ধীরে

ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, কোনোরূপ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার চিহ্নমাত্র তাঁহাতে নাই! তিনি ভাবিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা কে খণ্ডন করিতে পারে? তেতালার বারাণ্ডা হইতে পড়িয়া সে বালিকা কখনই জীবিত নাই। দ্রুতগমনে ফল কি? ধন্য নির্ভরতা! ধন্য মনের বল! যে সংবাদে অপর লোকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দৌড়িয়া গেল, পিতা সে সংবাদে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মন্থরগতিতে যাইতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া সংবাদ পাইলেন যে, সুখতারা জীবিত আছে! প্রথমে উহা বিশ্বাস করিলেন না, পরে যখন কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিলেন, তখন দেখিলেন কেবল জীবিত নহে, কোনো অঙ্গে গুরুতর আঘাতও লাগে নাই। তখন ভগবানের কৃপা দেখিয়া 'জয় জগদীশ!' বলিয়া কন্যার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। যিনি এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কন্যার নিঃসন্দিগ্ধ মৃত্যু স্থির করিয়াছিলেন, সেই পিতা পরম পিতার করুণায় অক্ষত কন্যার সহাস্য মুখ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ঐ বালিকা কন্যা ছাদ হইতে নিম্নে এক তৃণাচ্ছাদিত গৃহের চালের পার্শ্বের ঘনসংবদ্ধ বাঁশের বাখারির উপর পড়িয়া গড়াইয়া নিকটবর্ত্তী ভূতলে পড়িয়াছিল; সুতরাং সে কোনো অঙ্গে বেদনাও পায় নাই। এই ঘটনায় শশিপদ বাবুর মনের বল এবং ঈশ্বরে নির্ভরতা কেমন উজ্জ্বল রূপে ও স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। ধন্য তাঁহার মনের বল! যাহা দুর্বিষহ পুত্রশোকও আক্রমণ করিতে পারে না, যাহা পত্নী শোকেও বিচলিত হয় না! সকল শোকসংহারক অখিল ভয়বিপদ্‌বিনাশক পরম পিতার পদতলে যে চিত্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছে, সাংসারিক ঘটনার সাধ্য কি যে তাহাকে স্পর্শ করে! তাহা সম্পদে মত্ত হয় না, বিপদে ক্ষুব্ধ হয় না, উভয়কে সমভাবে আলিঙ্গন করে।

সহিষ্ণুতা মানবের একটি প্রধান গুণ। অপর সহস্র গুণে বিভূষিত হইলেও এক সহিষ্ণুতার অভাবে মানব কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হয়—

সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। সহগুণ মহাত্মাদের একটি প্রধান লক্ষণ। এই জগতে যে সকল পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বহুবিধ লোকহিতকর কার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অসাধারণ সহগুণশালী ছিলেন। সহিষ্ণুতা ক্ষমার সহোদরা। প্রচুর মনের বল না থাকিলে মানুষ কখনই সহিষ্ণু হইতে পারে না। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাঠকগণ অতীত যুগের মহাত্মাদের মানসিক বল ও সহিষ্ণুতার অনেক উদাহরণ পাঠ করিয়াছেন। আমারআজ এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম দেশহিতৈষী কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি শশিপদর অসাধারণ সহিষ্ণুতার একটি পরিচয় দিব।

ইনি যে সময়ে বরাহনগরে হিন্দুবিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময়ে অনেক লোক তাঁহার ঐ কার্য্যের বিরোধী ছিলেন; অধিক কি, দেশের প্রায় সমস্ত লোক—বাটীর পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহার এই শুভ কার্য্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। ঘরে বাহিরে তাঁহার স্বপক্ষে কেহই ছিল না। সেই সময়ে শশিপদ বাবু অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও অদম্য মানসিক বলের গুণেই সংকল্পিত কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহার এই অপরিসীম সহিষ্ণুতার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে তাঁহাকে ক্ষমার অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া তিনি নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ঘোর বিপক্ষ ছিলেন এখন তাঁহারা তাঁহার সহায়। অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা না থাকিলে ব্রহ্মর্ষি কখনই এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্নকরিতে পারিতেন না। কেবল কার্য্য সম্পন্ন নহে, অত দীর্ঘদিন নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে বঙ্গীয় হিন্দুমহিলাশ্রমের পরিচালনা সামান্য কথা নহে, অসামান্য সহগুণ ব্যতীত উহা কখনই সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন

স্থানের বিভিন্ন স্বভাবের অশিক্ষিত ত্রিশ চল্লিশটি বঙ্গীয় রমণীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁহাদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করা যে কি কঠিন ব্যাপার, সংসারী বাঙ্গালীকে বোধ হয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যে বাঙ্গালীর মেয়ের বাক্যযন্ত্রণায় কত লোককে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় লইতে হয়, সেই অশিক্ষিতা বয়স্থা এতগুলি মেয়েকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া যিনি তাঁহাদিগকে সুনিয়মে আবদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার সহিষ্ণুতার তুলনা নাই। এই আশ্রমের সকল মহিলাই পরস্পর সদ্ভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। সকলে তাঁহাকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রোগে শোকে নির্য্যাতনে এবং পারিবারিক দুর্ঘটনায় ব্রহ্মর্ষির অতুলনীয় সহিষ্ণুতা। তাঁহার বয়স যখন কুড়ি একুশ বৎসর, সেই সময়ে একবার তাঁহার পৃষ্ঠে একটি বড় ব্রণ হইয়াছিল। উহা অস্ত্র করিবার সময় তিনি এরূপ সহিষ্ণু ভাবে স্থির হইয়াছিলেন যে, ডাক্তার এবং বাটীর সকলে তাঁহার ঐ সহ্যগুণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অস্ত্র করিবার সময়ে তিনি একবার নড়েন নাই এবং মুখও বিকৃত করেন নাই।

একদা শশিপদ বাবু কলিকাতা হইতে বরাহনগরের বাড়ীতে যাইবার নিমিত্ত একখানি সেয়ারের গাড়ীতে উঠিয়াছেন; সেই গাড়ীর মধ্যে একদিকে তিনি এবং অপর একটি ভদ্রলোক, অন্য দিকে একটি মুসলমান উপবিষ্ট। এমন সময়ে কাশীপুরনিবাসী তন্তুবায়-জাতীয় একটি ইংরাজি-শিক্ষিত ভদ্রলোক বৈকুণ্ঠনাথ দে (Engineer) উক্ত গাড়ীতে উঠিতে আসিলেন। গাড়ীর দরজার নিকটে আসিয়াই তিনি মুসলমানটিকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। শশিপদ বাবু ঐ ব্যক্তির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং ঐ মুসলমানের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং উক্ত

বাবুকে ডাকিয়া গাড়ীতে তাঁহার জায়গায় বসাইলেন। কোনো দুর্ব্বলচেতা মানুষের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না।

শশিপদ বাবুর কোনো কার্য্যেই কেহ বাধা দিতে পারে নাই। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যেই তাঁহার অদম্য মানসিক বলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যবিবরণী মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই কেমন তেজস্বিতা ও অকুতোভয়তার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। শশিপদ বাবু যখন সস্ত্রীক বিলাত গমনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে একবার বাটীর আত্মীয় পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার পুরাতন বাটীতে লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই বহুবিধ দেশাচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া সমাজ হইতে এবং বাটী হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেই গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন অমনি বহির্ব্বাটীতে পুরুষদের এক কমিটি বসিল। অল্পকাল পরেই বহির্ব্বাটীতে শশিপদ বাবুর কনিষ্ঠ কেদার বাবুর ডাক পড়িল; কিন্তু কেদার বাবু বাহিরে গেলেন না। এ দিকে, ডাকের উপর ডাক, তার উপর ডাক আরম্ভ হইল; কেদার বাবু তথাপি গেলেন না। শশিপদ বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা বাটীর মধ্যে আসাতেই মহাগোল বাধিয়াছে। ও দিকে, বাটীর সম্মুখে লোকে লোকারণ্য! তাঁহাদের বৃহৎ পরিবার-ভুক্ত বাটীর কয়েকটি যুবক কোমর বাঁধিয়া ঐ রাস্তায় বিচরণ করিতেছে ও আস্ফালন করিতেছে। কি একটা কাণ্ড হইবে ইহা দেখিবার জন্য পথিকেরা দাঁড়াইয়া আছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! শশিপদ বাবু দেখিলেন যে, এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। দুই একটি স্ত্রীলোকের

সহিত দেখা করিয়াই তাঁহারা বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অগ্রে শশিপদ বাবু, মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, পশ্চাতে তাঁহাদের শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া একটি চাকর। শশিপদ বাবুর তৎকালীন মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে যেন নির্ভীকতার জ্বলন্ত অনল ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহা দেখিয়া কেহই আর তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিলনা। এই যে এত বিক্রম, এত আস্ফালন সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ! তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। বিশ্বাসীর স্বর্গীয় তেজের নিকট সকলেই পরাস্ত হইল। সূর্য্যোদয়ে খদ্যোৎসমূহ লুক্কায়িত হইল।

শশিপদ বাবু তাঁহার বাটীতে যে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এক সময়ে জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা মিসেস্ গ্র্যাণ্ট ঐ আশ্রমে বিশেষ সাহায্য করিতেন। তিনি অতিশয় তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। শশিপদ বাবু ঐ আশ্রমে কুমারীদিগকে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাহাদিগকে শিক্ষাদির ব্যয় বাবদ ১০৲ দশ টাকা করিয়া দিতে হইত; তবে অবস্থাবিশেষে অল্পও লওয়া হইত। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কোনো বালিকাবিদ্যালয় হয় নাই। তাই অনেক ব্রাহ্ম-বালিকাকে তিনি নিজ ব্যয়ে ঐ বিদ্যালয়ে লইতেন। একদা বরিশাল হইতে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মকুমারী ঐ আশ্রমে আসে। সে আশ্রমের ব্যয় দিতে একেবারেই অসমর্থ। শশিপদ বাবু তাহার কথা মিসেস গ্রাণ্টকে জানাইলেন এবং বলিলেন "আপনি যদি তার জন্য মাসে তিনটি করিয়া টাকা সাহায্য করেন, তা হ'লে আমি তার অন্যান্য সার সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করতে পারি।" মিসেস্ গ্র্যাণ্ট ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু এক মাস পরে শশিপদ বাবু উক্ত টাকার বিল করিয়া মিসেস্ গ্রাণ্টের নিকট পাঠাইলেন। তিনি ঐ বিল দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত টাকা দিতে অসম্মত হইলেন;' অধিকন্তু কথাচ্ছলে শশিপদ

বাবুকে 'স্বার্থপর' বলিলেন। শশিপদ বাবু তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং ভাবিলেন,একে ত প্রথমে স্বীকার করিয়া এখন অস্বীকার করা, তাহার উপর আমাকে স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার! তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সহসা কোন কাজের অনুষ্ঠান করেন না। কেহ কোনো অন্যায় বা অনিষ্ট করিলেও তিনি সহসা তাহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হন না। সময় লইয়া চিন্তা করেন, অনেক ভাবিয়া কি করা উচিত তাহা সিদ্ধান্ত করেন। এ দিকে, মিসেস্ গ্র্যাণ্ট অন্যান্য অনেক সাহায্য করেন বলিয়া যে, তিনি তাঁহার অসদ্ ব্যবহার এবং অন্যায় কথা সহ্য করিবেন সে প্রকৃতির লোকও তিনি নহেন। ঐ ঘটনার তিন দিন পরে তিনি মিসেস্ গ্র্যাণ্ট্‌কে এরূপ তেজঃপূর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন যে, সেই পত্র পাইয়া সেই দিনই মিসেস্ গ্র্যাণ্ট তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ আর তাঁর সে মূর্ত্তি নাই। অতি বিনীত ভাবে যে টাকা দিতে তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন সর্ব্বাগ্রে সেই টাকা দিলেন এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য আরো অনেক টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। একখানি চিঠিতে এরূপ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহাতে মিসেস্ গ্র্যাণ্টের ন্যায় তেজস্বিনী মহিলা নরম ও নত হইয়াছিলেন।

আর একবার মিসেস্ গ্র্যাণ্টের সহিত কি কথা লইয়া গোলমাল হয়। তাহাতে শশিপদ বাবু তাঁহার সম্মুখেই বলিয়াছিলেন,—"মিসেস গ্রাণ্ট, আপনি মনে কর্‌বেন না যে, আপনি সাহায্য বন্ধ কর্‌লে আমার আশ্রম বন্ধ হবে। আপনি জান্‌বেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যে আমাকে সাহায্য কর্‌তে আপনার মত মিসেস গ্র্যাণ্ট অনেক আছেন।" ইহা সামান্য দুর্ব্বলচেতা বা অবিশ্বাসী মানুষের কার্য্য নহে।

শশিপদ বাবু এক সময়ে কলিকাতার ব্যাথ্‌গেট্ কোম্পানীর আপীসে

কুড়ি টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। তখন তিনি ব্রাহ্ম হন নাই। একদিন সেই আপীসের এক কর্ম্মচারী সাহেব শশিপদ বাবুকে ঘরের খড়খড়ি বন্ধ করিতে বলিলেন। শশিপদ বাবু তাহার উত্তরে বলিলেন,—"খড়খড়ি বন্ধ কর্‌বার জন্য আপীসে অনেক বেয়ারা আছে, তাদের কাউকে বলুন।" এই কথা শুনিবামাত্র সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁকে কটুকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ আরম্ভ হইল; এমন কি, হাতাহাতিও হইয়াছিল। শেষে অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আসিয়া উভয়কে নিরস্ত করিলেন। তখন শশিপদ বাবু উক্ত সাহেবের অন্যায় ব্যবহার বিবৃত করিয়া একখানি দীর্ঘপত্র লিখিলেন এবং আপীসের অধ্যক্ষ সাহেব আসিলে তাঁহাকে সেই পত্রখানি দিলেন। তিনি সেই পত্র পড়িয়া কোথায় সেই সাহেবকে দণ্ড দিবেন, না শশিপদ বাবুকে চিঠি লিখিয়া সময় নষ্ট করিবার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শশিপদ বাবু তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"তোমার সময় নষ্ট করেছি, সুতরাং আজ আর বেতন আমি নেবো না। আমি আজ থেকে তোমার কাজও পরিত্যাগ করলুম।" এই বলিয়াই তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। তাহার বাটীতে পোষ্য পরিবার অনেকগুলি, আর কোনো আয় নাই। একেই বলে মনের বল। এরূপ অবস্থায় প্রকৃত তেজস্বী ভিন্ন কেহই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না।

শশিপদ বাবু এইরূপ তেজের সহিত দুই শত টাকা বেতনের পোষ্ট-আফিসের চাকরি এবং তাঁহার প্রাপ্য পেনসন্ এক কথায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যখন চাকরিতে ইস্তফা দিলেন, তখন পোষ্টমাষ্টার জেনারল বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে চাকরি রক্ষার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি আর তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুই শত টাকা

বেতনের চাকুরি সামান্য কারণে ছাড়া সাধারণ কথা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন আর কোনো বাঙ্গালী এরূপ তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। শশিপদ বাবু সেই কার্য্য পরিত্যাগের পর আর কখনও কোনো চাকুরি করেন নাই। তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবন দেশের হিতকার্য্যে উৎসর্গ করিয়া সেই কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন।

তেজস্বিতা এবং সাধুতার এরূপ একত্র সমাবেশ যে সকল মানুষের আছে, তাঁহারা জগতের পূজ্য তাঁহারা মানবজাতির শীর্ষস্থানীয়। এই প্রকার তেজস্বী সাধু সাধ্বীর দ্বারাই জগতের কল্যাণ হয়।

শশিপদ বাবুর মনের বল অটল অচল ও সুদৃঢ়—তাহা কিছুতেই কমে না। সে বল ও ঈশ্বরে নির্ভরতা সকল সময়ে শান্তিবিধান করে। একদিন তিনি বরাহনগরের বাটীতে সামাজিক উপাসনা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটা সাপ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অন্যান্য উপাসকেরা দেখিয়া 'সাপ! সাপ!' বলিয়া সভয়ে সে স্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করিল। শশিপদ বাবু উঠিলেন না। যেমন স্থিরচিত্তে ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন ছিলেন, সেইরূপ প্রশান্ত ভাবে বসিয়া রহিলেন। সাপ ক্রমে ক্রমে শশিপদ বাবুর নিকটবর্ত্তী হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল; তখনও তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। একেই বলে মনের বল—বিশ্বাস, ইহারই নাম প্রকৃত নির্ভরতা। ব্রহ্মর্ষি এই ভাবিয়া নির্ভয়ে বসিয়া রহিলেন যে, যিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, যাঁহা হইতে জীবন পাইয়াছি এবং যাঁহার কৃপায় জীবিত আছি, সেই জগন্মাতার ক্রোড়ে যখন বসিয়া আছি, তখন আর কিসের ভয়? একটা প্রবাদ আছে, "মার কোলে যখন সন্তান থাকে, তখন যমে তাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" বিশ্বজননীর কোলে থাকিয়া সাপের ভয়ে পলাইতে হইবে? সাপ হউক, বাঘ হউক, আর কালান্তক যমই হউক,

কার সাধ্য এখন আমাকে স্পর্শ করে! বাস্তবিকই সর্প তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া চলিয়া গেল। ইহাকেই বলে মনের বল।

আর একবার ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণগঞ্জে থাকিতে একদিন সেখানে উপাসনা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পায়ের উপর দিয়া একটা বৃশ্চিক চলিয়া গেল; তিনি তাহাতে একবার নড়িলেনও না। বৃশ্চিকও দয়াময় ব্রহ্মের নামে স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল না। পুরাণে ধ্রুবোপাখ্যানে কথিত আছে যে, ব্যাঘ্র ভল্লুক ভুজঙ্গম প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ ধ্রুবের মুখে দয়াময় হরির নাম শুনিয়া অবনত-মস্তকে ধ্রুবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। ইহা কেবল পুরাণের স্বকপোলকল্পিত উপাখ্যান নহে, সকল যুগেই তেজস্বী সাধুদিগের জীবনে ভগবানের লীলা এইরূপ ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে।

আর্য্যঋষিরা প্রায় সকল শাস্ত্রেই এই কথা বলিয়াছেন, "সকল বাসনা ছেদনই মুক্তি।" বাসনা বা কামনা থাকিতে মানব মুক্তি লাভ করিতে পারে না; এ কথার প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ব্যাস বলিতেছেন,—"সকল কামনার ক্ষয়ই নির্ব্বাণমুক্তি।" কিন্তু বাসনা ছেদনের পূর্ব্বে সংযমশিক্ষার আবশ্যক। ত্যাগের ভাব না থাকিলে মানুষ সংযমী হইতে পারে না। ত্যাগী হইলেই সে সংযমী হইবে। সংযমী হইলেই তাহার বাসনা-রাশি একটি একটি করিয়া লয় পাইতে আরম্ভ করে। ক্রমে সকল বাসনা ক্ষয় পাইয়া সকল দুঃখ নিবৃত্তি করে, ইহারই নাম মুক্তি। কিন্তু এই সমস্তের মূলেই চাই যথেষ্ট মনের বল। ব্রহ্মর্ষি শশিপদর এই মানসিক বল প্রচুর পরিমাণে আছে। তাই তিনি চিরসংযমী, ইন্দ্রিয়সংযম তাঁহার সাধনাসিদ্ধ। তিনি নিমন্ত্রণে গিয়া এরূপ পরিমিত আহার করিতেন

যে, বাটীতে আসিয়া যে সময়ে যাহা কিছু আহার করা তাঁহার দৈনিক অভ্যাস তাহার কিছুই বাদ দিতেন না।

ক্রোধের সময়ে তিনি কখনো কাহাকেও কটু কথা বলেন নাই, কটু ব্যবহারও করেন নাই। তাঁহার প্রতি যাহারা রাগ করিয়াছে তিনি বরাবরই তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। যেখানে অমিল সেই খানেই তিনি মিল দেখিতেন। চিরদিনই তিনি অমিলের মধ্যে মিলন স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। গৃহে পল্লীতে, গ্রামে নগরে, দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই তিনি মিলন স্থাপনের জন্য কার্য্য করিয়াছেন। ধর্ম্মের মধ্যে অমিল লইয়া চিরকালই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য ব্রহ্মর্ষি চিরদিনই দুঃখিত এবং সেই কারণেই তিনি সকল ধর্ম্মের মধ্যে মিল অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, ধর্ম্ম এক, উহা কখনো দুই বা বহু হয় না; সেই জন্য তিনি ধর্ম্মের মধ্যে মিলনের সূত্র সকল দেখিতে পাইতেন এবং সেই সকল সূত্র ধরিয়াই মিলন স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। 'সাধারণ ধর্ম্মসভা' ও 'দেবালয়' তাঁহার বাহিরের কার্য্য নহে—সেই চিরসেবিত সাধনাসিদ্ধ হৃদয়ের বিশ্বপ্রেমের স্ফুরণমাত্র। ধর্ম্মের মধ্যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ বিবাদ অপ্রেম বিদূরিত হইয়া যাহাতে প্রেম স্থাপিত হয়, সকলের মিলন হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করিতে পারে?

প্রচুর মানসিক বলে বলীয়ান্, সংযমী, বাসনাবিজয়ী, সর্ব্বস্বত্যাগী, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরাই চিরদিনই জগতে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। বাসনাবিজয়ী মুক্তপুরুষ না হইলে ঐ মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ব্রহ্মর্ষিতে আমরা প্রচুর মনের বল, সংযম, সর্ব্বস্বত্যাগ ও বাসনা বিজয় দেখিয়া আশান্বিত হইতে পারিব, জগতে সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখন ব্রহ্মর্ষি শশিপদ সকল বিষয়, সকল স্বার্থ, সকল কামনা ত্যাগ

করিয়া ইহ জীবনেই মুক্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় বাস করিতেছেন।

ধীরতা একটি প্রধান গুণ। এই গুণ না থাকিলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। যাহার ধৈর্য্য নাই, সেই চঞ্চলপ্রকৃতি মানব বিদ্যা বা ধর্ম্মশিক্ষার অধিকারী হইতে পারে না। যিনি ধীর যাঁহার চিত্ত সহসা বিচলিত হয় না, তিনিই সর্ব্ববিধ শিক্ষার অধিকারী হইতে পারেন। অনেকে এই স্বাভাবিক ধৈর্য্যগুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। লোকে তাঁহাদিগকে ধীর শান্ত বলে। যাঁহারা স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাঁহাদিগকে অস্থির বলে। কিন্তু ধৈর্য্যগুণ পরীক্ষা করা বড় কঠিন, বাহিরের স্থিরতা দেখিয়া ভিতরের ঐ গুণ জানিতে পারা যায় না। আবার বাহিরের চাঞ্চল্য দেখিয়া অন্তরে ধীরতার অভাব আছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাও ঠিক্ নয়। যাহা হউক এই ধীরতা বা ধৈর্য্যগুণ ক্রমশঃ-সাধনসাপেক্ষ। এই ধীরতা ক্রমশঃ সাধনা দ্বারায় বর্দ্ধিত করিতে হয়। আমাদের দেশে যাহাকে আত্মসংযম বলে, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই আত্মসংযম অভ্যাস করিলে প্রকৃত ধৈর্য্যগুণ লাভ করা যায়। এই আত্মসংযম অভ্যাসই মহাসাধনা। যাঁহারা আত্মোন্নতি লাভের একমাত্র উপায় আত্মসংযম অভ্যাস না করিয়া জগতে কার্য্য করিতে যান, তাঁহারা পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকেন, আর যাঁহারা ভগবদ্‌বিশ্বাসে মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়া আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছেন, চঞ্চল চিত্তকে সৎ সারথীর অশ্বের ন্যায় বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। তাঁহারা এই সংসারে অটল ভাবে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তাঁহারাই নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহাদের উপরে যতই বাধা বিঘ্ন ঝঞ্ঝাবাত আসুক না কেন, তাঁহারা অচল ও অটল। আর যাঁহারা পর

মেশ্বরকে প্রভু জানিয়া তাঁহার আদেশ পালন রূপ সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হন, তাঁহারা কেবল অচল ও অটল ভাব দেখাইয়াই নিরস্ত হন না, পরন্তু সকল প্রকার উপদ্রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে দূর করিতে যত্নবান্ হন। সুযোদ্ধা যেমন তাঁহার শিক্ষিত বশীভূত সুধীর ও বলবান্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজ্যাপহারক শত্রুসেনার সমরাঙ্গনে প্রবেশ করেন, ঐ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও সেইরূপ তাঁহার ধীর শিক্ষিত বশীভূত ও সবল মনের দ্বারা সংসার রাজ্যের শান্তিনাশক উপদ্রবসমূহকে দূর করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

ব্রহ্মর্ষি শশিপদের মনের বল অপরিসীম। তিনি স্থির ধীর অবিচলিত-হৃদয়। আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা তাঁহার সেই ধীরতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভগবানের উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি যেরূপ ধীর ভাবে সাংসারিক উপদ্রব সকল সহ্য করিয়াছেন, তাহা কোনও দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সংসারের শোকতাপ প্রভৃতি কিছুতেই তিনি অধীর হন নাই। তাঁহার পত্নীদ্বয় এবং পুত্রকন্যা-গণের মৃত্যুতে তিনি কখনো অধীরতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ বৎসর বয়সে যখন অল্পবয়স্কা পত্নীকে রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখনো ব্রহ্মর্ষি অচল অটল ধীর স্থির শান্ত ও নির্ব্বিকার! অমন উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুও তাঁহাকে বিচলিত বা অধীর করিতে পারে নাই। ঈদৃশ ঘটনায় অনেকে শয্যাশায়ী হন এবং কিছু দিনের মত তাঁহার কোনো কার্য্য করিবার শক্তিই থাকে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এরূপ ঘটনাতেও ব্রহ্মর্ষি সাংসারিক এতটুকু কার্য্যেরও ত্রুটী হয় নাই। যেমন শোকে অন্যান্য বিপদেও সেইরূপ। যত বড় বিপদই হউক না কেন ব্রহ্মর্ষি তাহাতে কোন দিনই কাতর নহেন; শুধু তাই নয়—প্রচণ্ড মনের বলে ধীরভাবে

সেই বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। চেষ্টার অসাধ্য হইলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। রোগ যন্ত্রণাতেও তিনি অধীর হন না। তাঁহার বাটীতে কত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে তিনি অচল অটল থাকিয়া তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না; বাহিরে কোনো দিনই তাঁহার কোনোরূপ দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ইহাই প্রকৃত ধীরতা। প্রচুর মানসিক বলে বলীয়ান্ হয়ে সম্পূর্ণ আত্মসংযম অভ্যাস ভিন্ন মানুষ কখনই এরূপ ধীরতা অবলম্বন করিতে পারে না। আবার এইরূপ ধীর না হইতে পারিলেও সংসার-সাগরে কূল পাওয়া যায় না। যিনি ধীরভাবে সংসারের এই সকল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিতে পারেন, ধীরভাবে মনের হাল ধরিয়া প্রসিদ্ধ নাবিকের ন্যায় এই আত্মতরীকে সংসার-সাগরের উত্তাল তরঙ্গের সুপথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনিই অচিরে এই মহাসাগরের কূল দেখিতে পান। সেই দর্শনই তাঁহার সুখ, সেই আশাই তাঁহার শান্তি, তিনি কখন সংসারকে দুঃখের কারণ বলিয়া ভাবেন না। প্রকৃত মনের বল থাকিলেই ইহা সম্ভব হয়। ব্রহ্মর্ষির জীবনে ঠিক্ তাহাই হইয়াছে